সন্ত্রাসবাদ ও ইসলাম

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট

সন্ত্রাসবাদ
ও
ইসলাম

অনুবাদ

এম রুহুল আমিন

মেসবাহউদ্দীন আহমাদ

নুরুল ইসলাম সরকার

সম্পাদনা

মুহাম্মদ আবদুল আজিজ

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট

www.pathagar.com

সন্ত্রাসবাদ ও ইসলাম

অনুবাদ
এম রুহুল আমিন
মেসবাহউদ্দীন আহমাদ
নুরুল ইসলাম সরকার

সম্পাদনা
মুহাম্মদ আবদুল আজিজ

প্রকাশক
বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট (বিআইআইটি)
১৪৫ গ্রীন রোড, ঢাকা-১২০৫, বাংলাদেশ
ফোন : ৯১১৪৭১৬, ৯১৩৮৩৬৭, ৮১২২৬৭৭
ফ্যাক্স : ৮৮০-২-৯১১৪৭১৬
ই-মেইল : biit_org@yahoo.com

প্রকাশকাল
১৮ আগস্ট ২০০৫, ৩ ভাদ্র ১৪১২

প্রচ্ছদ ও অক্ষর বিন্যাস
ছোঁয়া
৮৬/২ পুরানা পল্টন লেন
ঢাকা-১০০০, ফোন : ৯৩৪৪২৩০

মুদ্রণ
দি প্রিন্টমাস্টার
৮৬ পুরানা পল্টন লেন, ঢাকা-১০০০

মূল্য
অফসেট : একশত টাকা
সাদা : আশি টাকা

ISBN : 984-8203-42-3

Santrasbad O Islam is a compilation of three articles, translated by M Ruhul Amin, Mesbahuddin Ahmed & Nurul Islam Sarker, Edited by Mohammad Abdul Aziz, published by BIIT, 145 Green Road, Dhaka 1205, Bangladesh. Phone : 9138367, 9114716, 8122677, Fax : 880-2-9114716, E-mail : biit_org@yahoo.com. Price : Offset Tk. 100.00, White Tk. 80.00, US $ 10.00

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

সন্ত্রাস বর্তমান বিশ্ব সভ্যতার বিনাশকারী একটি শব্দ। সন্ত্রাসের সর্বসম্মত সংজ্ঞা এখনো নিরূপিত হয়নি। সর্বজন গৃহীত সংজ্ঞা গ্রহণের নিমিত্ত আন্তর্জাতিক বিশ্ব চেষ্টা করে আসছে। সন্ত্রাস ও সন্ত্রাসবাদের সংজ্ঞা যত তাড়াতাড়ি নিরূপণ করা যাবে ততই বিশ্ব শান্তির জন্য মঙ্গল। কোন্‌টি সন্ত্রাস আর কোন্‌টি সন্ত্রাস নয় বৃহৎ শক্তির মধ্যে এ ব্যাপারে প্রচুর মতভেদ আছে। আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে দেখা যায় কেউ অস্ত্র ধারণ করে নিজের অধিকার রক্ষার জন্য, স্বাধীকার আদায়ের জন্য। কারো কাছে এটি সন্ত্রাস আবার কারো কাছে দাবী আদায়ের পন্থা। সন্ত্রাস আর সন্ত্রাসবাদের উপর যথেষ্ট লেখালেখি হয়েছে। তবে সন্ত্রাস কেন হয়, এর প্রতিকার কীভাবে সম্ভব এ ব্যাপারে তেমন কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি বা তেমন কোন চিন্তা গবেষণাও করা হয়নি। আর্ন্তজাতিক পর্যায়ে যে সন্ত্রাস হয়ে থাকে তার কারণ অনুসন্ধান করা হলে অবশ্যই এর প্রতিকার সম্ভব হবে।
এ সন্ত্রাস দমনে সন্ত্রাসের মূল কারণ যে জুলুম, নির্যাতন ও বঞ্চনা - এ বিষয়টি যথাযথ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনায় না আনায় সঠিক প্রতিকারের ব্যাপারে কোন উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে না। সন্ত্রাসের বদলে সন্ত্রাস হচ্ছে বর্তমান পাশ্চাত্য নীতি নির্ধারকদের গৃহীত নীতি। ভিয়েতনামে পাশ্চাত্য পন্ডিতরা যেমন তৈরি করেছিলেন Strategy of Coercive Counter Intelligence. এ নীতিই তারা বহাল রেখেছে বিভিন্ন মুসলিম দেশে দৃশ্যমান সন্ত্রাস দমনে। প্রশাসক, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, চিন্তাবিদ ও আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ এ ব্যাপারে কী ভাবছেন সে বিষয়ে 'সন্ত্রাসবাদ ও ইসলাম' গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য কুরআন ও হাদিসে জিহাদের কথা বলা হয়েছে। ইসলামের জিহাদকে পাশ্চাত্য সংস্কৃতিতে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করা হয়। ধর্ম ও রাষ্ট্রের জন্য যে জিহাদ তাকে কোন কোন পক্ষ সন্ত্রাস বলে অভিহিত করে থাকে। সন্ত্রাস ও ইসলাম গ্রন্থে সন্ত্রাস, ইসলাম, জিহাদ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। সন্ত্রাসের কারণ, এর প্রতিকার বিষয়ে গ্রন্থটি থেকে বিস্তারিত জানা যাবে। সন্ত্রাস সম্পর্কে আমাদের মধ্যে যে ভুল বুঝাবুঝি রয়েছে এ গ্রন্থে তা অপসারণের চেষ্টা করা হয়েছে। AJISS -এ প্রকাশিত বিভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও সমাজবিজ্ঞানীর লেখা হতে প্রবন্ধগুলো নির্বাচিত করে সর্ব শ্রেণীর পাঠকের সুবিধার্থে এগুলোর অনুবাদ প্রকাশ করা হয়েছে।

এম জহুরুল ইসলাম এফ সি এ
ভাইস-প্রেসিডেন্ট, বিআইআইটি

www.pathagar.com

ভূমিকা

সন্ত্রাসবাদ বিশ্বের একটি জটিল সমস্যায় পরিণত হয়েছে। বিশ্বে কখনো সন্ত্রাস এতো ব্যাপক ছিল না। এসব সন্ত্রাসে পৃথিবী নিরাপত্তাহীন হয়ে পড়েছে এবং অসংখ্য সাধারণ মানুষ নিহত হচ্ছে। একই সঙ্গে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস ব্যাপক হচ্ছে। বিভিন্ন শক্তিশালী রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক আইনের সীমালংঘন করে অন্য রাষ্ট্রে হামলা চালাচ্ছে। মুসলিম দেশগুলো এসব হামলার শিকারে পরিণত হয়েছে। ইরাক, আফগানিস্তানে হামলা হয়েছে। ইরান ও উত্তর কোরিয়ায় হামলা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

ইসলাম শান্তি, সম্প্রীতি ও সহনশীলতায় বিশ্বাস করে। ইসলামের অবস্থান সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে। অথচ এগারোই সেপ্টেম্বরের ঘটনার পর ইসলামে নির্দেশিত জিহাদকেও একটি আগ্রাসী মতবাদ হিসেবে বর্ণনা করা হচ্ছে।

আলোচ্য বইতে আসমা বারলাস, লুই এম সাফী এবং ড. আবদুর মুগনী'র এতদসংক্রান্ত তিনটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ সন্নিবেশিত হয়েছে। এর একটিতে একদিকে জিহাদের ব্যাপারে প্রাচীন মতবাদগুলোকে খন্ডন করা হয়েছে। অপরটিতে কুরআন ও হাদিসের সামগ্রিক বিবেচনায় যুদ্ধ ও শান্তির মৌলিক উদ্দেশ্যসমূহকে উপস্থাপন করা হয়েছে।

তৃতীয় প্রবন্ধটিতে জিহাদ সম্পর্কে কোন কোন মুসলমান কর্তৃক চরম ব্যাখ্যা এবং পাশ্চাত্যের উদ্দেশ্যমূলক ব্যাখ্যার স্বরূপ তুলে ধরা হয়েছে। একই সাথে মুসলমানদের প্রবণতা, কার্যকলাপ এবং বিদ্যমান রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়াদি বিবেচনায় আনা হয়েছে। এখানে মুসলিম ও অমুসলিম দু'পক্ষের অবস্থানকে আলোচনা ও পর্যালোচনা করা হয়েছে যাতে করে দু'পক্ষই সতর্ক হতে পারে এবং মানবতার কল্যাণে একযোগে কাজ করতে পারে।

আশা করি 'সন্ত্রাসবাদ ও ইসলাম' বইটি বিদ্যমান বিভ্রান্তি দূর করতে সহায়ক হবে এবং চিন্তাশীল ব্যক্তিদের বিশেষ করে সামাজিক বিজ্ঞান সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে রেফারেন্স বই হিসেবেও কাজে লাগবে।

শাহ আবদুল হান্নান

চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ইনস্টিউট অব ইসলামিক থ্যট

www.pathagar.com

সূচিপত্র

ইসলাম, যুদ্ধ ও শান্তি
মূল : লুই এম সাফী
অনুবাদ : এম রুহুল আমিন
০৭

জিহাদ, ধর্মযুদ্ধ ও সন্ত্রাসবাদ
অপব্যাখ্যার রাজনীতি
মূল ঃ আসমা বারলাস
অনুবাদ ঃ মেসবাহউদ্দীন আহমাদ
৩৭

ইসলাম ও সন্ত্রাস
মূল : ড. আবদুর মুগনী
অনুবাদ : নুরুল ইসলাম সরকার
৫৬

সন্ত্রাস ও সন্ত্রাসবাদ
এর মোকাবেলায় আন্তর্জাতিক প্রয়াস
অনুবাদ : এম রুহুল আমিন
৬৬

www.pathagar.com

ইসলাম
যুদ্ধ ও শান্তি

মূল : লুই এম সাফী* // অনুবাদ : এম রুহুল আমিন

ইসলামী ও অনৈসলামী রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে নীতি ও আদর্শের যে সম্পর্ক তা ইসলামের মদীনার জামানায়ও ছিল। আব্বাসী যুগে মুসলিম ফকীহগণ যুদ্ধ ও শান্তির তত্ত্ব প্রণয়ন করেছিলেন। এসব তত্ত্বের মূলনীতিগুলো হয়ত জিহাদের বেলায়, শান্তি চুক্তি, আমন বা আরো বিশেষ কোন বিষয়ের মধ্যে পাওয়া যাবে। যেমন বিষয়গুলো হলো, আল খারাজ (ভূমিকর) এবং আল সিয়ার (জীবনী/ইতিহাস)। যুদ্ধ পরিচালনার মূলনীতি, ইসলামী রাষ্টগুলোতে যুদ্ধ পরিচালনার নীতি আদর্শের উদ্দেশ্য এবং অন্যান্য রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে এর সম্পর্কের ব্যাপারে মুসলমান ফকীহগণ গবেষণা করেছেন।

এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য দু'টো। প্রবন্ধে জিহাদের ব্যাপারে প্রাচীন মতবাদগুলোকে খন্ডন করা হবে। আর এটিও এখানে আলোচনা করা হবে যে, জিহাদের যুক্তিগুলোকে এখানে আনা হয়েছে কতগুলো প্রশ্নের কারণে বিশেষ করে ঐতিহাসিকভাবে উদ্ভুত আইনগত সিদ্ধান্তের (আহকাম শারিয়া) কারণে। এই কারণগুলো হলো আব্বাসী যুগে ইসলামী রাষ্ট্র ও বিভিন্ন ইউরোপীয় শাসকদের মধ্যকার যুদ্ধবিগ্রহ। প্রাচীনপন্থী ফকিহগণ যুগের চিরন্তন দাবীকে সামনে রেখে একটি নিখাদ তত্ত্ব যে উদ্ভাবন করতে চেষ্টা করেনি তা নয়। এটি পাঠকের সামনে তুলে ধরাও এ প্রবেন্ধর উদ্দেশ্য। কুরআন ও হাদিসের সামগ্রিক বিবেচনায় যুদ্ধ ও শান্তির বিষয়টিকে বিবেচনায় আনাও এ প্রবন্ধের লক্ষ্য। এ নতুন ধারণার উপর ভিত্তি করে যুদ্ধ ও শান্তির মৌলিক উদ্দেশ্যগুলোকে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। সমস্যার বিষয়গুলোকে দূরীভূত করার জন্য দু'টো পদ্ধতি এখানে ব্যবহার করা হয়েছে -এর একটি হলো প্রচীনপন্থী ফকিহগণের ব্যবহৃত ইসলামী আইন শাস্ত্রের (উসুল আল ফিকহ) মধ্য থেকে বৈধ বিষয়গুলোর ব্যবহার, আরেকটি হলো ঐতিহাসিক। সশস্ত্র জিহাদ ইসলামের প্রথম রাষ্ট্র ও বিভিন্ন রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে সংগঠিত হয়েছিল।

আমি আমার এ লেখায় জিহাদ শব্দের পরিবর্তে যুদ্ধ ("War" or "Fighting") শব্দটা ব্যবহার করবে।

প্রাচীনপন্থী ফকিহগণ সশস্ত্র যুদ্ধকে বুঝাতে জিহাদ শব্দটি ব্যবহার করেছেন। যুদ্ধ বলতে জিহাদকে বুঝানো হলেও কুরআনে ব্যবহৃত জিহাদ শব্দটি ব্যপকতর অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে।

---

* লুই এম সাফী, আমেরিকার ডেট্রয়েট -এর ওয়েন স্টেট ইউনিভার্সিটির একজন শিক্ষার্থী।

www.pathagar.com

মক্কী সূরাতে (২৯ : ৬, ৬৯) এবং (২৫ : ৫২) -এ সর্বপ্রথম যখন মুসলমানদেরকে যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হয় এরও পূর্বে জিহাদ শব্দটি ব্যবহৃত হয়। মক্কী যুগে আল্লাহ্‌র পথে শান্তিপূর্ণ অর্থে জিহাদ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

> যারা আমার উদ্দেশ্যে সংগ্রাম করে আমি তাদেরকে অবশ্যই আমার পথে পরিচালিত করব (২৬ : ৬৯);
> যে কেহ সাধনা করে, সে তো নিজের জন্যই সাধনা করে ... (২৯ : ৬);
> সুতরাং বিধর্মীদের কথায় কর্ণপাত করো না। বরং তাদের বিরুদ্ধে সর্বশক্তি দিয়ে জিহাদ কর (২৫ : ৫২)

এই তিনটি আয়াতে মুসলমানদেরকে শত নির্যাতনের বিরুদ্ধে ধৈর্যের সাথে মোকাবেলা করতে বলা হয়েছে।

তাদের বিরুদ্ধে প্রচার চালাতে আর ইসলাম প্রচারে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

সামরিক কৌশল আর যুদ্ধ জিহাদের বিভিন্ন পন্থার মধ্যে একটি পন্থা। জিহাদের বিভিন্ন পন্থা রয়েছে, শান্তিপূর্ণ প্রতিরোধ, জুলুম আর নির্যাতনের বিরুদ্ধে ধৈর্যধারণ। জিহাদের কোন্ পন্থা অবলম্বন করা হবে তা অবস্থার প্রেক্ষিতে আর মুসলমান জাতির স্বার্থে যা প্রয়োজন তাই গ্রহণ করতে হবে।

তিনটি মূলনীতির উপর যুদ্ধ ও শান্তির প্রাচীনপন্থী তত্ত্ব নির্ভর করে।[১]

১. বিশ্বটা দু'ভাগে বিভক্ত ঃ দার আল ইসলাম (ইসলামী দুনিয়া), ইসলামী আইনে পরিচালিত এলাকা; আর দার আল হারব (যুদ্ধে লিপ্ত দুনিয়া) যে এলাকা ইসলামী শাসনের আওতায় আসেনি। (ইমাম শাফিঈ'র মতে তৃতীয় আরেকটি এলাকা দার আল আহদ বা চুক্তিবদ্ধ এলাকা রয়েছে। তাঁর এই তৃতীয় এলাকার ধারণা অতিরিক্ত বলে মনে হয়। তাঁর মতে কর প্রদানের মাধ্যমে ইসলামী রাষ্ট্রের সাথে অনৈসলামী রাষ্ট্রের চুক্তি হতে পারে। তাঁর এ ধারণা প্রাচীনপন্থী লেখকদের ন্যায় একই যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত)

২. জিহাদের স্থায়ী শর্ত হলো দার আল ইসলাম। দার আল হারব দার আল ইসলাম-এ বিলীন হওয়া পর্যন্ত এ জিহাদ চলবে। সুতরাং ইসলামী রাষ্ট্রে ইসলাম প্রচারের অন্যতম হাতিয়ার হলো জিহাদ আর ইসলামী রাষ্ট্রের সম্প্রসারণেও জিহাদ অন্যতম মাধ্যম।

৩. দার আল ইসলাম আর দার আল হারব -এর সহাবস্থান তখনই সম্ভব যখন দার আল হারব বার্ষিক জিযয়া কর প্রদান করে থাকে।

শতাব্দীকাল ধরে যুদ্ধ ও শান্তির প্রাচীনপন্থী ধারণা চলে আসছে। মাঝে মাঝে হয়ত এ ধারণার কিছু কিছু পরিবর্তন হয়েছে। অনেকগুলো বড় বড় ত্রুটি আর ইসলামের অনেক প্রয়োজনীয় নীতির লংঘন সত্ত্বেও এ তত্ত্বের মূলনীতি বিনা বাধায় চলে আসছে।[২] এর জন্য যে সময়ে এই তত্ত্বটির বিকাশ ঘটে তখনকার রাজনৈতিক অবস্থাকেই অংশত এর জন্য দায়ী করা যেতে পারে; মুসলমানদের ইতিহাসের ঐ সময়কার অবস্থাকেও এর জন্য দায়ী করা হয়।

www.pathagar.com

প্রাচীনপন্থী মুসলমান ফকীহদের মতে দার আল ইসলাম আর দার আল হারব এর মধ্যে স্থায়ীভাবেই বিরাজমান যুদ্ধ পরিস্থিতিকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমটি হলো বহুশ্বেরবাদীদের নির্মূল করার যুদ্ধ। এই বহুশ্বেরবাদীদের সামনে দু'টো পথ রয়েছে : তাদেরকে হয় ইসলাম কবুল করে নিতে হবে না হয় ধ্বংস হয়ে যেতে হবে। দ্বিতীয়, কিতাবীদের সাথে আপোষরফা। তাদের জন্য তিনটি পথ খোলা আছে : ইসলাম কবুল করা, তাদেরকে এক ঘরে হয়ে থাকা, জিয্য়া কর দেয়া। এটি করা হলে তারা তাদের নিজেদের ধর্ম নিয়ে থাকতে পারবে। মুসলমানদের কাছ থেকে নিরাপত্তা পাবে বা মুসলমান সৈন্যদের সাথে থেকে যুদ্ধ করতে পারবে। [৩] কোন রাষ্ট্রের জন্য যুদ্ধ হলো একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। মুসলমান আর অমুসলমান রাষ্ট্রের মধ্যকার সম্পর্ক অমুসলমান রাষ্ট্রের ইসলাম কবুল করা বা তাদের দ্বারা মুসলমান রাষ্ট্রকে বার্ষিক কর (tax) দেয়ার উপর নির্ভর করে।

ধ্বংসাত্মক যুদ্ধ

যুদ্ধ ও শান্তির ব্যাপারে প্রাচীনপন্থী পদ্ধতি কুরআন ও হাদিসের মধ্যে পাওয়া যায়।

> তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকবে যাবত ফিতনা দূরীভূত না হয় এবং আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত না হয়। যদি তারা বিরত হয় তবে সীমালংঘনকারিগণ ব্যতীত আর কাকেও আক্রমণ করা চলবে না (২ : ১৯৩)। [৪]
>
> অতঃপর নিষিদ্ধ মাস অতিবাহিত হলে অংশীবাদীদেরকে যেখানে পাবে বধ করবে, তাদেরকে বন্দী করবে, অবরোধ করবে এবং প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের জন্য ওৎ পেতে থাকবে; কিন্তু যদি তওবা করে, সালাত কায়েম করে ও যাকাত দেয় তবে তাদের পথ ছেড়ে দিবে, আল্লাহ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু (৯ : ৫)।
>
> যাদের প্রতি কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে তাদের মধ্যে যারা আল্লাহয় ঈমান আনে না ও পরকালেও নয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা নিষিদ্ধ তা নিষিদ্ধ করে না এবং সত্য দ্বীন অনুসরণ করে না তাদের সাথে যুদ্ধ করবে, যে পর্যন্ত না তারা নত হয়ে স্বহস্তে জিয্যা দেয় (৯ : ২৯)।
>
> তাদের বিরুদ্ধে আমাকে যুদ্ধ করতে নির্দেশ দেয়া হয় যে পর্যন্ত না তারা বলে : "আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই," তারা যখন এরূপ বলে, তখন আমার কাছে তাদের জীবন ও ধন সম্পদ অলংঘনীয়, তাদেরকে গ্রহণের জন্য ইসলামে যদি এর সমর্থন থাকে। আল্লাহর কাছে তারা দায়ী থাকবে। [৫]

কুরআনের উপযুক্ত আয়াতটি মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে। কিছু কিছু মুসলমান ফকীহ্ ও তফসীরকারদের মতে বহুশ্বেরবাদী অমুসলমানরা ইসলাম কবুল না করা পর্যন্ত বা "কিতাবীরা" জিয্য়া কর না দেয়া পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে।

অন্যভাবে বলতে গেলে কুরআনের এ আয়াতটিকে সাধারণ বিধি (হুকুম আম্) [৬] হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। এটাকে (৯ : ৫) ও (৯ : ২৯) আয়াতে বর্ণিত বিশেষ বিধির আওতায় ব্যাখ্যা করতে হবে। ব্যবহারিক অর্থে এ আয়াতে এটিকে বুঝানো হয়েছে যে,

www.pathagar.com

অমুসলমানদেরকে ইসলাম কবুলে বাধ্য করতে হবে অথবা তাদেরকে ইসলামী রাষ্ট্রের অধীনস্ত হয়ে থাকতে হবে। কুরআনের আয়াতগুলোর আসল ও একান্ত অর্থ হলো অমুসলমানদের বিরুদ্ধে মুসলমানদেরকে যুদ্ধ করতে হবে বা মুসলমানদের বিরুদ্ধে তারা যাতে আক্রমণ বা কোন নির্যাতনমূলক ব্যবস্থা নিতে না পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে।[৭] আয়াতগুলোর দ্বিতীয় যে ব্যাখ্যা তা শুধু অর্থপূর্ণই নয় বরং সংহতিপূর্ণও বটে। তবে আয়াতগুলোর ব্যাপারে নিম্নবর্ণিত ব্যাখ্যাও হতে পারে :

> যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তোমরাও আল্লাহর পথে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর; কিন্তু সীমালংঘন করো না। আল্লাহ্ সীমালংঘনকারীকে ভালবাসে না (২ : ১৯০)।
> যেখানে তাদেরকে পাবে হত্যা করবে এবং যে স্থান হতে তোমাদেরকে বহিষ্কৃত করেছে তোমরাও সেই স্থান হতে তাদেরকে বহিষ্কার করবে। ফিতনা হত্যা অপেক্ষা গুরুতর, ... (২ : ২৯১)।
> যদি তারা বিরত হয় হবে আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু (২ : ১৯২)।
> তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকবে যাবত ফিতনা দূরীভূত না হয় এবং আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত না হয়। যদি তারা বিরত হয় তবে সীমালংঘনকারীগণ ব্যতীত আর কাকেও আক্রমণ করা চলবে না (২ : ১৯৩)।

এ আয়াতে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যারা যুদ্ধ করে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে নির্দেশ করা হয়েছে। তবে মুসলমানদেরকে আক্রমণকারী দল হিসেবে এটি করতে না করা হয়েছে। উদওয়ানকে এখানে "আগ্রাসন" বলা হয়েছে। কুরআনে শত্রুতাকে নির্দেশ করতে গিয়ে "আগ্রাসন" শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে।[৮] কোন কোন ফকীহ'র মতে "যারা তোমাদেরকে আক্রমণ করে তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর..." কুরআনের আয়াতের এ অংশটি সূরা তওবা-এর মাধ্যমে রদ (মানসুখ) করা হয়েছে। এটি আবার ইবনে আব্বাস, উমর ইবনে আব্দুল আজিজ, মুজাহিদ ও অন্যান্য ফকীহ্ ও পন্ডিতগণ কর্তৃক গৃহীত হয়নি। তাদের মতে কুরআনের এ আয়াত দৃঢ় (মুহকাম) অবস্থানে অবস্থিত।[৯] আল তাবারীর মতে এ আয়াতটি রদ করা হয়নি, তিনি উমর ইবনে আব্দুল আজীজের ব্যাখ্যাটির সাথে একমত পোষণ করেন। আব্দুল আজিজ আয়াতের ব্যাখ্যা এভাবে করেন : "নারী, শিশু ,সন্ন্যাস, যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে না তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো না।"[১০] উমর নারী, শিশু ও সন্ন্যাস, যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের বিষয়টিকে সীমিত করলেও সাধারণ অর্থে আয়াতটিতে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যারা শত্রুতা পোষণ করে না বা যুদ্ধ করে না তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করার সাধারণ নীতির কথা বলা হয়েছে। উমর যে বিষয়টির উপর গুরুত্ব দিয়েছেন (তাখসিস) তা আয়াতের মূল অর্থের সাথে[১১] (ইবারাহ আল্ নাস) এক হয়নি। এটি শুধুমাত্র ঐতিহাসিক ও বাস্তব বিবিচনার উপর ভিত্তি করেই করা হয়েছে।

আয়াতটিতে (২ : ১৯১) পৌত্তলিক আরবদের বিরুদ্ধে মুসলমানদেরকে যুদ্ধ করতে বলা হয়েছে, মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করে যে ক্ষমাহীন ভুল তারা করেছে তার বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য বলা হয়েছে। ইসলাম কবুলের কারণে মুসলমানদেরকে যে বাড়ী

www.pathagar.com

থেকে বের করে দেয়া হয়েছে এবং তাদের প্রতি যে জুলুম করা হয়েছে তার জন্য প্রতিশোধ গ্রহণের তাগিদ দেয়া হয়েছে।

শেষের আয়াতটিতে (২ : ১৯৩) জালেম শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়েছে। যারা মানুষকে তাদের বিশ্বাস আর ধর্মের বিরুদ্ধে নির্যাতন করেছে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের কথা বলা হয়েছে। এ আয়াতের মাধ্যমে এটি স্পষ্ট হলো যে, ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে, যারা মানুষের উপর জুলুম করে, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে। এ যুদ্ধ কিন্তু মানুষকে ইসলামে দীক্ষিত করার জন্য জোর প্রয়োগ বা বাধ্য করার কথা বলে না। এ আয়াতে এটিও বলা হয়েছে যে, লক্ষ্য অর্জিত হওয়ার পর আর মুসলমানদেরকে যুদ্ধ করতে হবে না। অন্য কথায় বলতে গেলে যারা অন্যদেরকে স্বাধীনভাবে তাদের স্বাধীন ধর্ম চর্চায় বাধা সৃষ্টি করে সে সব জালেমদের বিরুদ্ধে পূর্বের চার আয়াতে যুদ্ধ ঘোষণার কথা বলা হয়েছে।

সূরা তওবার আয়াতগুলোকে কোন কোন মুসলমান ফকীহ্ অমুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনার ব্যাপারে চূড়ান্ত বক্তব্য বলে অভিহিত করেছেন। কুরআনের এ আয়াতগুলোর দ্বারা অমুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার ব্যাপারে অন্য আয়াতগুলো বাতিল হলো কিনা ফকীহদের মধ্যে এ ব্যাপারে মতভেদ আছে। যাদের মতে কুরআনের আয়াতের রদ হওয়ার বিষয়টি বলা হয় তাদের যুক্তি হলো এ আয়াতগুলোতে যে যুদ্ধ সম্পর্কিত সাধারণ নিয়ম রয়েছে তা পূর্ববর্তী নিয়ম নীতিগুলোকে বাতিল করে দেয়। তাই দেখা যায় রদ হওয়ার ব্যাপারে আয়াতের মধ্যে শব্দে শব্দে যা কিছু (নাস) আছে তার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত না হয়ে যুক্তি আর চিন্তা চেতনার উপর (Reasoning and Speculation) ভিত্তি করে করা হয়েছে। রদ হওয়ার বিষয়টি মতামতের উপর ভিত্তি করে তথা আলাপ আলোচনা ও যুক্তি খন্ডনের উপর ভিত্তি করে সামনে এসেছে। আল তাবরীর মতে, "রদ হওয়ার ব্যাপারে মুসলমান ফকীহদের মধ্যে মত বিরোধ থাকলে কোন সাক্ষ্য প্রমাণ ছাড়া রদ হওয়ার বিষয়টিকে আমরা গ্রহণ করতে পারি না।"[১২] আসলে এটি বলার অপেক্ষা রাখে না যে, রদ হওয়ার ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রমাণ হিসেবে কুরআন হাদিসের প্রমাণ ছাড়া তাবারী কিছু গ্রহণ করতে রাজী হননি। তাছাড়া সাক্ষ্য প্রমাণ গ্রহণ পন্ডিতদের আরেকটি মতামত হিসেবে স্বীকৃত। সূরা তওবাতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, ইসলাম কবুল না করা পর্যন্ত মুসলমানদেরকে বিধর্মীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে।

> ... অংশীবাদীদেরকে যেখানে পাবে বধ করবে, তাদেরকে বন্দী করবে, অবরোধ করবে এবং প্রত্যেক ঘাটিতে তাদের জন্য ওৎ পেতে থাকবে; কিন্তু তারা যদি তওবা করে, সালাত কায়েম করে ও যাকাত দেয় তবে তাদের পথ ছেড়ে দেবে ... (৯ : ৫)।

কুরআনে মুশরিকীন শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এর এক বচন মুশরিক। মুশরেক শব্দের বহু বচন দিয়ে বিশেষভাবে পৌত্তলিক আরবদেরকে[১৩] বুঝানো হয়েছে। এ প্রসঙ্গে উদ্ধৃত প্রথম আয়াতটির বিষয় এখানে প্রাণিধানযোগ্য :

www.pathagar.com

ইহা সম্পর্কচ্ছেদ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ হতে সেই সমস্ত অংশবাদীদের সাথে যাদের সাথে তোমরা পরস্পরিক চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিলে (৯ : ১)।

পৌত্তলিক আরবদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধের কারণ মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদের সর্বাত্মক যুদ্ধ। মক্কা-মদীনা থেকে মুসলমানদেরকে বের করে দেয়া হয়। মুসলমানদের সাথে তারা যে চুক্তি করেছিল তা লংঘন করা হয়।

> তোমরা কি সেই সম্প্রদায়ের সাথে যুদ্ধ করবে না যারা নিজেদের প্রতিশ্রুতি ভংগ করেছে ও রাসূলের বহিষ্করণের জন্য সংকল্প করেছে? তারাই প্রথম তোমাদের বিরুদ্ধাচরণ করেছে ... (৯ : ১৩)।

আয়াত নাযিল হওয়ার কোন বিশেষ অবস্থার কথা এখানে প্রতিপাদ্য বিষয় নয়, বিষয়টি হলো মূল বক্তব্যের সাধারণ তাৎপর্য যা ইসলামী আইনের (উসূল আল ফিক্‌হ) মুল নীতিতে গৃহীত হয়ে থাকে। এ যুক্তি গ্রহণের বিশেষত্ব হলো, আয়াত নাযিল হওয়ার প্রেক্ষাপটের কারণেই পূর্ববর্তী আয়াত নাযিল হয়েছে তা কিন্তু নয় বরং মূল বক্তব্যকে সীমিত করার জন্য আয়াতে বর্ণিত উদ্দেশ্যটাই (হিকমাহ আল নাস) এখানে মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। আব্দুল ওহ্হাব খাল্লাফ এ প্রসঙ্গে বলেন :

আয়াতের মূল বিষয়টি আয়াত নাযিল হওয়ার পরিস্থিতির কারণের চেয়ে আলাদা। এর কারণ, মুসলমান ফকীহগণের ইজমা হলো আয়াতের মূল বক্তব্যটাকে সীমিত পরিসরেই ব্যবহার করতে হবে। এ ব্যাপারে তাদের মধ্যে কোন মতবিরোধ নেই। ফকীহগণ আয়াত নাযিল হওয়ার সাধারণ পরিস্থিতি সম্পর্কে যা বলেছেন তা হলো :

"আয়াতের সাধারণ তাৎপর্যটিই এখানে মুখ্য, নাযিল হওয়ার পরিস্থিতি এখানে মুখ্য নয়।"[১৪]

উপরের আলোচনাতে এটিই স্পষ্ট হলো যে, সূরা তওবার ১-১৪ আয়াত শুধুমাত্র রাসূল (রা)-এর সময়ে বসবাসরত অংশবাদীদের বিরুদ্ধেই প্রযোজ্য হবে। তাদের ইসলাম কবুলে বল প্রয়োগ করতে হবে, কারণ তারা মুসলমানদের সাথে কৃত চুক্তি ভংগ করেছিল আর মদীনা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিল। কুরআনের (৯ : ৪) আয়াতে এ ব্যাপারে জোর দেয়া হয়েছে যে, যারা মুসলমানদের সাথে কৃত চুক্তি পালন করবে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে :

> তবে অংশবাদীদের মধ্যে যাদের সাথে তোমরা চুক্তিতে আবদ্ধ ও পরে যারা তোমাদের চুক্তি রক্ষায় কোন ত্রুটি করেনি এবং তোমাদের বিরুদ্ধে কাকেও সাহায্য করেনি তাদের সাথে নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত চুক্তি পালন করবে; আল্লাহ মুত্তাকীদেরকে পছন্দ করেন (৯ : ৪)।

পূর্বের যুক্তিগুলো হাদিসের ক্ষেত্রেও ব্যবহার করা যেতে পারে, "আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে সেসব লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে যে পর্যন্ত না তারা ঘোষণা করে যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই।" এখানে "লোকদের" বলতে অংশীবাদী আরবদেরকেই বুঝানো হয়েছে। এ শব্দ দ্বারা সব 'লোক' বুঝানো হলে এর দ্বারা বায়জেন্টাইন খ্রিস্টান ও

www.pathagar.com

পার্সিয়ান জোরাস্ট্রিয়ান (মাযুস) দেরকেও বুঝানো হতো। কিন্তু বিষয়টি এরূপ নয়, 'লোক' দ্বারা এখানে একান্তভাবেই আরব অংশীবাদীদেরকেই বুঝানো হয়েছে। "লোক'র" এই ব্যাখ্যা উমর ইবন আল খাত্তাবের বর্ণনায় আরও স্পষ্ট হয়েছে :

আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার জন্য যে পর্যন্ত না তারা ঘোষণা করে যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই আর মুহাম্মদ তাঁর বান্দা ও রাসূল। যে পর্যন্ত না সালাত কায়েম করে, যাকাত আদায় করে। তারা যদি এগুলো পালন করে তাদের জান-মাল রক্ষার দায়িত্ব অংলঘনীয়, ইসলামে যদি এগুলো তাদের কাছ থেকে নিয়ে নিতে না বলা হয়। আল্লাহর কাছে তারা দায়ী থাকবে। [১৫]

এখানে 'লোক' বলতে আরব অংশবাদীদেরকেই বুঝানো হয়েছে। সূরা তওবায় তাদেরকেই বাধ্যতামূলকভাবে ইসলাম কবুলের কথা বলা হয়েছে। স্পষ্ট কারণেই এ শব্দটি দ্বারা সব মানুষকে বুঝানো হয়নি আর কুরআনও তা নির্দেশ করেনি। কিতাবীদেরকে তাদের নিজ নিজ ধর্ম পালনের জন্য রাসূল (সা) ই অনুমতি দিয়েছিলেন। 'লোক' দ্বারা সব লোককে বুঝানো হলে কুরআন-হাদিসে কিতাবীদেরকে যে সুযোগ দেয়া হয়েছে তার লংঘন করা হবে।

আবু হানিফা ও তাঁর শিষ্য আবু ইউসুফও বলেন যে, অংশীবাদী আরবদেরকেই ইসলাম কবুলে বল প্রয়োগ করতে বলা হয়েছে। আবু ইউসুফ আল খারাজ গ্রন্থে আল হামান ইবন মুহাম্মদ -এর উদ্ধৃত করে বলেন "রাসূল (সা) আল হাযারের জোরাস্ট্রিয়ানদের সাথে এই মর্মে চুক্তিতে আবদ্ধ হন যে, তারা জিয্য়া দিবে, মুসলমানরা এর বিনিময়ে তাদের নারীদের বিবাহ করবে না বা তাদের জবাইকৃত পশু খাবে না।" [১৬] তাঁর মতে, জিয্য়া সব বহুশ্বেরবাদীদের কাছ থেকে গ্রহণ করতে হবে, যেমন, জোরাস্ট্রিয়ান (মাযুস), পৌত্তলিক, আগুন-পাথর উপাসক, সাবিয়ান (সাবিয়্যিন)। তবে অংশীবাদী আরবদের কাছ থেকে জিয্য়া নেয়া যাবে না কেননা তাদেরকে ইসলাম কবুলে বল প্রয়োগ করা হয়েছে। [১৭] নাফীঈ আর মালিকও বলেছেন যে, জিয্য়া কেবল বহুশ্বেরবাদীদের কাছ থেকেই গ্রহণ করা যাবে। [১৮]

আপোষের যুদ্ধ

আমরা পূর্ববর্তী আলোচনায় দেখলাম যে, ইসলাম কবুলে আরবের অংশীবাদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার কথা বলা হয়েছে, ইসলাম গ্রহণে বল প্রয়োগের কথা বলা হয়েছে। এরূপ নিদের্শ করা হয়েছে আরব অংশীবাদীদের শত্রুতা আর অসততার জন্যই। অধিকাংশ বিখ্যাত ফকীহ আবু হানিফা ও তাঁর বিখ্যাত দু'শিষ্য আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ ইবন আল হাসানসহ আল শাফী এবং মালিক আপোষপূর্ণ যুদ্ধের কথা বলেছেন। তাঁদের মতে কিতাবী ও অনারব বহুশ্বেরবাদীদের সাথে মুসলমানদের বার্ষিক জিয্য়া কর প্রদানের ভিত্তিতে সন্ধি স্থাপিত হতে পারে। এ জিয্য়া ইসলামী রাষ্ট্রকে প্রদান করা হবে। এসব ফকীহ্ আপোষের যুদ্ধকে সকল অমুসলমানদের জন্য প্রযোজ্য সাধারণ নীতি হিসেবে মনে করেন। মুসলমান ফকীহ্গণ বিশ্বকে দার আল ইসলাম ও দার আল হারব

www.pathagar.com

এ দু'অঞ্চলে ভাগ করেছেন। আর এই বলে ঘোষণাও করেছেন যে, দার আল হারব যতদিন না দার আল ইসলামে বিলীন হবে ততদিন এ দু'য়ের মধ্যে স্থায়ীভাবে যুদ্ধ চলতেই থাকবে। এ বিষয়টি সূরা তওবার ২৯ নং আয়াতে স্পষ্ট করে বর্ণিত হয়েছে।

যাদের প্রতি কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে তাদের মধ্যে যারা আল্লাহয় ঈমান আনে না ও পরকালেও নয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা নিষিদ্ধ করেছেন তা নিষিদ্ধ করে না এবং সত্য দ্বীন অনুসরণ করে না তাদের সাথে যুদ্ধ করবে, যে পর্যন্ত না তারা নত হয়ে স্বহস্তে জিয্‌য়া দেয় (৯ : ২৯)।

এ আয়াতের মর্মার্থ এতটা ব্যাপক ভিত্তিক নয়। সেজন্য এ আয়াতটি সাধারণ বিধি হিসেবে গৃহীত হতে পারে না। "কিতাবীদের" বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য চারটি নির্ণায়ক রয়েছে : যারা আল্লাহ্য় বিশ্বাস করে না, শেষ বিচারের দিনের উপর যাদের বিশ্বাস নেই। আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল যা বলেছেন তা মানে না, সত্য ধর্মকে স্বীকার করে না। এ আয়াতের দ্বারা কিতাবীদেরকেই সার্বিকভাবে নির্দেশ করা হয়নি। [১৯] তবে কিতাবীদের কোন একটি বিশেষ দলকে এ আয়াত দ্বারা আলাদা করা হয়েছে।

মুসলমান ফকীহ্গণ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মাধ্যমে (explication of th text, তাওয়িল আল নাস) সাধারণ নীতির (আল হুকম আল আম) উদ্ভাবন করেছেন। আল্ মাওয়ারদি "কিতাবী লোকদের" ব্যাপারে বলেন :

> আল্লাহর কথা বলতে গিয়ে "তারা আল্লাহ্য় বিশ্বাস করে না" (এ কথা "কিতাবীদের" ব্যাপারে প্রযোজ্য) মন্তব্য করা হয়েছে এর কারণ তারা আল্লাহর একত্বে বিশ্বাস করলেও তাদের ঈমানকে (আল্লাহর) দু'টো কারণের একটি দিয়ে খন্ডন করা যেতে পারে; প্রথমত, (এই কথা বলে) তারা আল্লাহর কিতাবে বিশ্বাস করে না, আল্লাহর কিতাব তো আল কুরআন। দ্বিতীয়ত, (এই কথা বলা যে) তারা আল্লাহর রাসূল (সা) কে স্বীকার করে না। আল্লাহ যাদেরকে রাসূল হিসেবে মনোনীত করেছেন তাদের উপর ঈমান রাখাও বিশ্বাসের অংগ। [২০]

আল্ মাওয়ারদির যুক্তি যে আয়াতের মূল থেকে বা এর ভাব থেকে এসেছে তা নয়। আল্ মাওয়ারদি ও অন্যান্য প্রাচীনপন্থী ফকীহ্গণের যুক্তি চলমান ঘটনা প্রবাহ ও বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে উপস্থাপিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে একটি প্রশ্নের জবাব নিম্নে সবিস্তারে বর্ণনা করা হলো।

পূর্বের আলোচনা থেকে আমরা এ সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, কুরআনের ৯ : ২৯ আয়াতটিতে একটি বিশেষ ধরনের হুকুমতের কথা (হুকমে খাস) বলা হয়েছে; যেমন আমাদের পূর্বোক্ত আলোচনার চারটি কারণের জন্য কিতাবীদের একটি বিশেষ দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধের কথা বলা হয়েছে। আমরা আরও সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, "কিতাবীদের" ব্যাপারে এসব শর্তগুলোর ব্যবহার সর্বোপরি আয়াতের মুল বক্তব্যের ভাবের (নাস) উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রাচীনপন্থী ফকীহদের এ যুক্তির উপর বিতর্ক হতে পারে। সে যাই হোক, আমি এখানে আয়াতটিকে আর ব্যাখ্যায় যাবো না বা

www.pathagar.com

আমি এমন কোন বিস্তারিত আলোচনাতেও যাবো না যা উল্লেখিত চারটি শর্তে "কিতাবীদের" কে সাধারণ অর্থে জড়িয়ে ফেলতে পারে। এর কারণ, আমরা পরবর্তীতে দেখতে পাবো যে, রাসূল (সা) ও মুসলমানদের প্রথম বংশধররা এ শর্তগুলোকে "কিতাবীদের" বিরুদ্ধে তাদের ধ্বংসাত্মক আক্রমণের বিষয়টি নষ্ট করে দেয়। "যারা স্বেচ্ছায় জিয্য়া দেয় আর আল্লাহর প্রতি স্বেচ্ছায় আনুগত্য স্বীকার করে তাদের উপর ধ্বংসাত্মক কোন আক্রমণ করা হবে না।"

"কিতাবীদের' উপর জিয্য়া বসানো হয়েছে মুসলমান রাষ্ট্রের আয় বাড়ানোর জন্য নয় বা মুসলমান সম্প্রদায়ের সম্পদ বৃদ্ধির জন্য নয়। অমুসলমানদের উপর আর্থিক চাপ বৃদ্ধির লক্ষ্যে বা তাদেরকে চাপ দিয়ে ইসলাম কবুল করানোর জন্যেও নয়; এর কারণ জিয্য়া'র পরিমাণ নাম মাত্র, এটি শুধু সামর্থবান পুরুষদের উপরই বর্তানো হয়েছিল। নারী, শিশু, সন্ন্যাস বা গরীব অমুসলমানদেরকে তা থেকে বাদ দেয়া হয়েছিল। [২১] জিয্য়া আসলে প্রতিকী। এর মাধ্যমে শত্রুভাবাপন্ন রাষ্ট্র বা জালেম শাসকদেরকে বশে আনা যায় যাতে মুসলমানরা তাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে ইসলাম প্রচার করতে পারে। আর অমুসলমানদেরকে ইসলাম কবুলের সুযোগ করে দিতে পারে। জিয্য়া'র উদ্দেশ্যও ছিল তাই। সারাকসি'র মতে,

> জিয্য়া'র উদ্দেশ্য কোন টাকা পয়সা নয়। এর উদ্দেশ্য ইসলাম প্রচার, এর কারণ (অমুসলমানদের সাথে) শান্তি চুক্তি স্থাপনের ফলে যুদ্ধ শেষ হয়ে যায়, শান্তিপ্রিয়দের (অমুসলমানদের জন্য) জন্য নিরাপত্তা বিধান হয়, ফলে তারা মুসলমানদের সাথে শান্তির সাথে বসবাস করতে পারে। ইসলামের সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারে বা ভর্ৎসনার সম্মুখীন হয়, যার মধ্য দিয়ে তারা ইসলাম কবুল করতে পারে। [২২]

অন্য কথা বলতে গেলে জিয্য়ার উদ্দেশ্য হলো অমুসলমান ভূ-খন্ডে ইসলাম প্রচারের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা অর্জন আর যারা ইসলাম কবুল করতে চায় তাদেরকে সে সুযোগ করে দেয়া।

জিয্য়ার উদ্দেশ্য ছিল শত্রুভাবাপন্ন রাষ্ট্রকে বন্ধু রাষ্ট্রে পরিণত হওয়ার সুযোগ করে দেয়া। বন্ধুভাবাপন্নদের কাছ থেকে এ কর আদায় করা হতো না। মুসলমানদের সাথে পারস্পরিক সমঝোতায় পৌঁছলেও তাদের কাছ থেকে জিয্য়া আদায় করা হতো না। এসব ক্ষেত্রে তাদের কাছ থেকে মুসলমানরা সামরিক সমর্থন লাভ করতো। আল তাবারী তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে বলেছেন, জনৈক সাইয়্যেদ ইবন মাকরিন জনৈক অমুসলিমের সাথে একটি চুক্তিতে উপনীত হন এই মর্মে যে, তোমাদের যারা আমাদের সাথে কাজ করবে তারা এর জন্য পুরস্কার পাবে, তোমাদেরকে জিয্য়া দিতে হবে না। তোমাদের জান, মাল ও ধর্মের নিরাপত্তা দেয়া হলো। কেউ এ চুক্তির কোন শর্তের পরিবর্তন করতে পারবে না। [২৩] এভাবে সুরাকাহ ইবন আমর ২২ হিজরী / ৬৪২ খ্রিঃ -এ আর্মেনিয়ানদের সাথে একটি সন্ধি চুক্তি স্থাপন করেন। ফলে আর্মেনিয়ানদেরকে কোন জিয্য়া কর দিতে হতো

www.pathagar.com

না, এর জন্য তারা মুসলমানদেরকে সামরিক সহযোগিতা দিয়েছিল। [২৪] হাবীব ইবন মুসলিমাহ্ আল ফাহরী, আবু ওবায়দার ডিপুটি আনটাকিয়ানদের সাথে এরূপ একটি চুক্তিতে উপনীত হন। ফলে তাদের সেবার বিনিময়ে মুসলমানদেরকে কোন জিয্‌য়া দিতে হতো না। [২৫] এ ব্যাপারে ফতুহ্ আল বুলদান-এও বর্ণিত আছে যে,

> আর্মেনিয়ানদের সাথে মুয়াবিয়া ইবন আবী সুফিয়ান একটি সন্ধি চুক্তি স্থাপন করেছিলেন, ফলে আর্মেনিয়ানরা তাদের ধর্ম, রাজনীতি ও বিচার ব্যবস্থার স্বাধীনতা ভোগ করেছিল। তাছাড়া তিন বৎসর পর্যন্ত তাদেরকে জিয্‌য়া থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছিল। এরপর তাদের পছন্দ মত জিয্‌য়ার একটা নির্ধারিত অংশ পরিশোধ করতে পারত। আর তা যদি না পারত মুসলমানদেরকে পনের হাজার যোদ্ধা দিয়ে সাহায্য করতে ও আর্মেনিয়ানদের দেশ রক্ষায় সাহায্য করতে পারত। মুয়াবিয়া বায়জেন্টাইনীদের আক্রমণের সময় প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জাম দিয়ে আর্মেনিয়ানদেরকে সাহায্য করতে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।[২৬]

উপরের আলোচনাগুলো থেকে এটি স্পষ্ট হলো যে, শত্রুভাবাপন্ন রাজনৈতিক সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে মৈত্রী স্থাপনের একটি সেতু বন্ধনের অংশ হিসেবে জিয্‌য়া প্রথা চালু করা হয়েছিল। অমুসলমানদের ভূ-খন্ডকে এর মাধ্যমে মুসলমানদের কাছে উন্মুক্ত করে দেয়া হয়েছিল। অমুসলমানদেরকে শাসন করা বা তাদের উপর কোন বোঝা চাপিয়ে দেয়া এর লক্ষ্য ছিল না। পূর্ববর্তী আলোচনায় জিয্‌য়ার মূল বিষয়টি বেশ ভালভাবেই বুঝা যায় ইসলামী রাষ্ট্র ও ইথিওপিয়ার মধ্যকার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের মধ্যে।

শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান : আবিসিনিয়া ও ইসলাম

আবিসিনিয়া ও প্রথম যুগের ইসলামী রাষ্ট্রের মধ্যকার সম্পর্ককে একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসেবে আলোচনা করা যায়। এর মাধ্যমে দু'টো ভূ-খন্ডের (দার আল ইসলাম এবং দার আল হার্‌ব) মধ্যকার প্রাচীনপন্থী ধ্যানধারণাকে খন্ডন করা যায়। এই ধারণার মধ্যে জিয্‌য়া কর না প্রদান করার কারণে অমুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে স্থায়ী যুদ্ধাবস্থা অব্যাহত রাখা হয়েছিল। মালিকী মাযহাবের প্রবক্তা ইমাম মালিক ইবন আনাস'র মতে মুসলমানদের আবিসিনিয়া জয়ের প্রয়োজন ছিল না। তিনি এ ব্যাপারে রাসূল (সা)-এর একটি হাদিস উদ্বৃত করে বলেন, "আবিসিনীয়দেরকে শান্তিতে থাকতে দাও যে পর্যন্ত তারা তোমাদের শান্তিতে থাকতে দেয়।" ইমাম মালিক এই হাদিসের যথার্থতা সম্পর্কে নিশ্চিত করে কিছু বলেন নি। তিনি একথা বলেছেন যে, মানুষ এখনো আবিসিনীয়দেরকে আক্রমণের বিষয়টি এড়িয়ে চলে।" [২৭]

আরব ও উত্তর আফ্রিকায় ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অনেকদিন পরও আবিসিনিয়া তার খ্রিস্টান সত্ত্বা বজায় রেখেছিল। এখানে চতুর্থ হিজরী পর্যন্ত [২৮] খুব কম মুসলমান পরিবারই দেখা গিয়েছে। প্রথম থেকে আবিসিনীয়রা মুসলমান শরণার্থীদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল। মুসলমান শরণার্থীদেরকে আবিসিনীয়রা তাদের দেশে স্বাগত জানিয়েছিল আর জালেমদের হাত থেকে রক্ষা করেছিল। মুসলমানদেরকে ফিরিয়ে আনার জন্য যে

www.pathagar.com

প্রতিনিধি আবিসিনিয়ায় প্রেরণ করা হয়েছিল তার হাতে মুসলমানদেরকে সপর্দ না করে তাদেরকে বাঁচানো হয়েছিল। তখন আবিসিনিয়া ও ইসলামী রাষ্ট্রের মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় ছিল। আবিসিনিয়াই একমাত্র রাষ্ট্র যে তখন ইসলামকে স্বীকার করে নিয়েছিল। [২৯]

আবিসিনিয়া ও ইসলামী রাষ্ট্রের মধ্যকার সুসম্পর্কের বিষয়টি দুটো ভূ-খন্ডের ধারণা বাতিল করে দেয়। দুটো রাষ্ট্রের মধ্যে সব সময় যুদ্ধাবস্থা বিরাজ করবে তাও বন্ধুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রের মধ্যে কাম্য হতে পারে না। আর এভাবে অমুসলমান রাষ্ট্রের সার্বভৌত্বও স্বীকার করা হয় না। আবার এ ধরনের রাষ্ট্রকে সব সময় ইসলামী রাষ্ট্রকে একটি করও দিয়ে যেতে হয়। আবিসিনিয়া কখনো মুসলিম জাতি ছিল না। তবুও আবিসিনিয়াকে ইসলামের প্রথম যুগে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছিল। এই রাষ্ট্রের উপর কোন কর বসানো হয়নি বা তাকে ইসলামী রাষ্ট্রের আওতায় আনার জন্য বলও প্রয়োগ করা হয়নি। আবিসিনিয়াকে ইসলামী ভূ-খন্ড বলা যাবে না (দার আল ইসলাম)। এখানে কখনো ইসলামী আইন চালু ছিল না। [৩০] তবে এটিকে যুদ্ধের এলাকা (দার আল হার্‌ব) বলেও চিহ্নিত করা হয়নি। এই রাষ্ট্রটিকে কখনো ইসলামী রাষ্ট্রের আওতায় আনার চেষ্টাও করা হয়নি বা এর বিরুদ্ধে স্থায়ীভাবে কোন যুদ্ধাবস্থাও ঘোষণা করা হয়নি। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় যে, আবিসিনিয়ার বেলায় দুটো ভূ-খন্ডের সম্পর্ক একটি ভংগুর ভিত্তির উপর দন্ডায়মান ছিল।

কোন কোন মুসলমান সূত্রের দাবী হলো আবিসিনিয়ার রাজা রাসূল (সা) -এর দাওয়াত পেয়ে রাসূল (সা) -এর জীবিতকালে ইসলাম কবুল করেছিলেন। ইবন আল আথির এ প্রসঙ্গে লিখেছেন : "রাসূল (সা) -এর পত্র পেয়ে আল নাজাসী রাসূল (সা) -এর উপর বিশ্বাস স্থাপন করেন। রাসূল (সা) এর কথামত জাফর ইবন আবু তালিবের উপস্থিতিতে তিনি ইসলাম কবুল করেন। এরপর ষাট জন আবিসিনীয়কে তাঁর পুত্রের নেতৃত্বে রাসূল (সা) -এর কাছে পাঠানো হয়, যদিও সে আল মদিনার কাছে [৩১] নদীতে ডুবে মৃত্যুবরণ করে।" নাজাসীর ইসলাম গ্রহণ আবিসিনিয়ার মর্যাদার ব্যাপারে কোন হেরফের করেনি।

আবিসিনিয়ায় ইসলামের শাসন কায়েম না থাকলেও আবিসিনীয় ভূ-খন্ডের কোনই সমস্যা হয়নি। প্রাচীনপন্থী লেখকদের মতে এ ভূ-খন্ড যুদ্ধাঞ্চল হলেও কোন সমস্যা ছিল না। [৩২]

ইসলাম ও শান্তি

ইসলামের প্রথম যুগ থেকেই ইসলামের অন্তর্নিহিত মূল্যবোধের অংশ হিসেবে কুরআন শান্তির কথা বলে আসছে। প্রকৃত অর্থে "ইসলাম" ও "শান্তি"র উৎপত্তি একই শব্দ 'সালাম' থেকে। আল্লাহ মুসলমানদের জন্য উপহার হিসেবে সালাম কে পছন্দ করেছেন। [৩৩] মুসলমানদের প্রথম জামানা থেকে এবং পূর্বের মুসলিম প্রজন্ম থেকে যে কেউ দেখতে পাবেন যে, মুসলমানদের কাছে শান্তিই ছিল মুখ্য, আর জুলুম নির্যাতনের বিরুদ্ধে শান্তিমূলক ব্যবস্থা হিসেবে যুদ্ধ ছিল অবলম্বন।

> "তুমি মানুষকে প্রতিপালকের পথে আহ্বান কর হিকমত ও সদুপদেশ দ্বারা আর তাদের সাথে আলোচনা কর সদ্ভাবে (১৬ : ১২৫)।

www.pathagar.com

চরম বিরোধিতা সত্ত্বেও রাসূল (সা) শান্তির সাথে মানুষদেরকে ইসলামের পথে ডাকতেন। কুরাইশদের সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে মুসলমানদেরকে শান্ত থাকতে নির্দেশ দিতেন। মক্কী জমানায় মুসলমানদের এরূপ শান্তিবাদ ছিল পরিবর্তন আনয়নের লক্ষ্যে একটি রাজনৈতিক কৌশল আর মারাত্মক ধ্বংসের হাত থেকে মুসলমানদেরকে রক্ষা করাই ছিল এ শান্তিবাদের লক্ষ্য।

মদীনায় হিজরতের পরে ইসলামের বিরোধিতাকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অনুমতি দেয়া হয়েছিল।

> যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হলো তাদেরকে যারা আক্রান্ত হয়েছে; কারণ তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে। আল্লাহ্ নিশ্চয়ই তাদেরকে সাহায্য করতে সক্ষম; তাদেরকে তাদের ঘর-বাড়ী হতে অন্যায়ভাবে বহিষ্কৃত করা হয়েছে শুধু এই কারণে যে, তারা বলে আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ (২২ : ৩৯-৪০)।

আল্লাহর তরফ থেকে যুদ্ধের অনুমতি লাভের পর কুরাইশদের বিরুদ্ধে বদর ও ওহুদের ন্যায় যুদ্ধ করা হয়। আরব গোত্রগুলো কুরাইশদের সাথে হাত মেলানোর পর আরব নগর রাষ্ট্র মদীনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা ত্বরান্বিত হয়। এই যুদ্ধের লক্ষ্যই ছিল শিশু ইসলামী রাষ্ট্রকে ধ্বংস করে দেয়া। মুসলমানদের ধ্বংসের প্রক্রিয়া সর্বোচ্চে পৌঁছে যায় যখন খন্দকের যুদ্ধ শুরু হয়। তখন কুরাইশ আর তার মিত্রদের দশ হাজার যোদ্ধা মদীনা ঘিরে ফেলে।[৩৪] এতদসত্ত্বেও মুসলমানগণ শত্রুদের কাবু করার জন্য কুরাইশ ও তার মিত্রদের সাথে হুদায়বিয়ায় সন্ধি চুক্তি করেছিলেন।[৩৫] দুর্ভাগ্য যে, কুরাইশ ও তার মিত্ররা এ সন্ধি চুক্তিকে সম্মান দেখাতে পারেনি। তারা চুক্তির শর্তাবলী লংঘন করে। এটি এখন স্পষ্ট হয়ে যায় যে, তাদের শত্রুতার সংস্কৃতিকে ধ্বংস করে শত্রুতা আর অবিশ্বাসকে চুরমার করে দিতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন এই পরিস্থিতিতে জোর করে ইসলাম কবুলে বাধ্য করা। মদীনার ইহুদীদের প্রতি মুসলমানদের নীতি ছিল শান্তিতে সহঅবস্থান। রাসূল (সা) -এর মদীনায় আসার কয়েক মাসের মধ্যেই মুহাজের আনসারদের সাথে ইহুদী ও অন্যান্যদের একটি চুক্তি সম্পাদন করেন। এ চুক্তি ছিল মৈত্রী ও সহযোগিতার চুক্তি।[৩৬] এ চুক্তির মাধ্যমে ইহুদীদের শুধু ধর্মীয় স্বাধীনতা ও নিরাপত্তাই দেয়া হয়নি, তাদেরকে কিছু কর্তব্য ও দায়িত্বের আওতায় স্বায়ত্বশাসনও দেয়া হয়। এ চুক্তির শর্তগুলো মুসলমান ও ইহুদী উভয়ের জন্যই ছিল প্রযোজ্য। চুক্তিটি ছিল নিম্নরূপ :

> ... ইহুদীগণ মুসলমানদের পক্ষে লড়াই করবে, তাদের ধনসম্পদ মুসলমানদের ন্যায় সমানভাবে যুদ্ধে ব্যয় করবে। ইহুদীগণ ইহুদীগণের ধর্মীয় স্বাধীনতা ভোগ করবে আর মুসলমানগণ মুসলমানদের ধর্মীয় স্বাধীনতা ভোগ করবে। উভয় সম্প্রদায় তাদের জনগণের নিরাপত্তার অধিকার ভোগ করবে তবে অন্যায়কারী ও অপরাধীরা এর আওতার বাইরে থাকবে। অন্যায়কারী আর অপরাধীরা তাদের নিজেদের ও পরিবারের ধ্বংস সাধন করে।[৩৭]

www.pathagar.com

মদীনার ইহুদী ও মুসলমানদের মধ্যকার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বিখ্যাত ইহুদী নেতা আব্দুল্লাহ ইবন সালামের ইসলাম গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত বজায় ছিল। এই ঘটনার ফলে ইহুদী নেতাদের মধ্যে ভয় ছড়িয়ে পড়ে। তারা মনে করেছিল যে, মুসলমানরা মদীনায় এসে তাদের পদ মর্যাদায় আঘাত হানবে। যার কারণে ইহুদীরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার শুরু করে। প্রথমে কথার মাধ্যমে যুদ্ধ শুরু করে, পরে কুরআনকে অস্বীকার করে, রাসূল (সা) -এর ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করে, তাঁর বার্তাকে সন্দেহ করে.। সবশেষে তারা ইসলামের শত্রুদের সাথে হাত মিলিয়ে ষড়যন্ত্র করে। [৩৮]

বদর যুদ্ধের পরই ইহুদী ও মুসলমানরা পরস্পর মুখামুখি হয়। এ সময় বানু কায়নুকা গোত্রের কিছু ইহুদী জনৈক মুসলমান মহিলাকে জোর করে তার অধিকার খর্ব কর। এ ঘটনায় এক ইহুদী ও মুসলমান পথচারীর মধ্যে সংঘর্ষ বেঁধে যায়। এতে এক ইহুদী ও এক পথচারীর মৃত্যু হয়। এর সূত্র ধরে মৃত মুসলমানের পরিবার ও বানু কায়নুকার মধ্যে যুদ্ধ বেঁধে যায়।

ইহুদী ও মুসলমানের এই সংঘর্ষের কথা রাসূল (সা) -এর কানে পৌঁছলে রাসূল (সা) বানু কায়নুকার কাছে আক্রমণ বন্ধ করতে বলেন আর তাঁদের মধ্যকার শান্তি ও নিরাপত্তার চুক্তি মেনে চলার কথা স্মরণ করিয়ে দেন। বানু কায়নুকা রাসূল (রা) - এর কথায় উপহাস করে। তারা মুসলমানদের সাথে লড়াই চালিয়ে যেতে থাকে। [৩৯]

একইভাবে বানু আল নাদির'র বিরুদ্ধেও তাদের অসদাচরণ ও অবিশ্বাসের কারণে অসন্তোষের সৃষ্টি হয়। ওয়ায়ে ইবন আখতাব, সালাম ইবনে আবু আল হুকায়েক, কিনানাহ ইবন আল হুকায়েক, বানু ওয়ায়েল গোত্রের দু'নেতাসহ তিন নেতা পাঠিয়ে মুসলমানদের সাথে কৃত চুক্তি তারা ভংগ করে। এসব লোকদেরকে তারা মক্কায় পাঠিয়ে কুরাইশ ও তাদের মিত্রদেরকে মদীনার মুসলমানদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তোলে। আর মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদের সমর্থন পূর্ণব্যক্ত করে। ইহুদী দলের লোকজন পৌত্তলিক আরবদের খন্দকের অভিযানে মুসলমানদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনায় সমর্থ হয়। এই অভিযানে কুরাইশ ও তার মিত্রদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের পরিচালিত এযাবতকালের সব অভিযানের চেয়ে বেশী তিক্ত অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে হয়। [৪০] একইভাবে দেখা যায় ইসলামী রাষ্ট্র আর বায়জেন্টাইন ও পার্সিয়ার মধ্যকার লড়াই ইসলামী রাষ্ট্রের সম্প্রসারণের জন্য ঘটেনি, বায়জেন্টাইন আর পার্সিয়ানরা উভয়েই মুসলমান আর তাদের বণিকদলকে নাজেহাল করেছিল বা শান্তিপূর্ণভাবে ইসলাম প্রচারে বাধা দান করেছিল।

বায়জেন্টাইনীদের রক্ষাকারী উত্তর দিকের খ্রিস্টান গোত্রের বিরুদ্ধে প্রথম পরিচালিত অভিযান দাওমাহ আল যানদাল ছিল মুসলমানদের পরিচালিত অভিযান শাস্তিদানকারী ও প্রতিশোধ গ্রহণমূলক একটি অভিযান। এ অভিযানের কারণে কাদাহ ও বানু কালব [৪১] - এর ন্যায় গোত্রের লোকজন সিরিয়ায় প্রেরিত মুসলমান বণিকদলের উপর আক্রমণ করে তাদেরকে উত্যক্ত করেছিল। মুতা'র অভিযানও ছিল মুসলমানদের প্রতিশোধমূলক

www.pathagar.com

অভিযান। মুসলমান বার্তাবাহক ও উত্তর দিকে রাসূল (সা) প্রেরিত ধর্ম প্রচারকদের বিরুদ্ধে ইহুদীদের চুক্তি ভংগ করে যে অন্যায় করেছিল তার বিরুদ্ধে পরিচালিত শাস্তিমূলক ব্যবস্থার অংশ হিসেবে মুসলমানদের মুতা'র অভিযান পরিচালিত হয়। রাসূল (সা) উত্তরের অঞ্চলগুলোতে ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার জন্য এই অভিযান পরিচালনা করেন।

রাসূল (সা) বসরার গভর্নরের কাছে হারিস উবন উমায়েরকে প্রেরণ করেন। আল হারিস বসরায় পৌঁছে শাহরাবিল আমীর ইবন আল গাসানীর সাথে সাক্ষাত করেন। গাসানী তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, "তুমি কি মুহাম্মদের বার্তাবাহক? আল হারিস উত্তরে বললেন, হ্যাঁ, এরপর শাহরাবিল তার লোকজনকে তাঁকে হত্যা করতে নির্দেশ দেন। আল হারিসকে হত্যা করা হয়।" [৪২] এরপর রাসূল (সা) পাঁচজনকে পাঠান বানু সুলায়মানের কাছে ইসলাম প্রচার করতে। তাদেরকেও নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। এ যাত্রায় তাদের মধ্যকার একমাত্র নেতা ব্যক্তিটিই দুর্ঘটনাক্রমে বেঁচে যায়। রাসূল (সা) ইসলামের দাওয়াত দেয়ার জন্য আল শামেও পনের জন লোক প্রেরণ করেন। দাত আল তালহ্ আল শামের বাইরে একটি এলাকা। এখানেও রাসূল (সা) -এর প্রেরিত ধর্মপ্রচারকদেরকে ঠান্ডা মাথায় হত্যা করা হয়।" [৪৩] উত্তরের খ্রিস্টানরা তাদের কাছে যারা ইসলাম প্রচার করেছিল তাদেরকে হত্যা করেছিল। [৪৪] সেজন্য তাদের সাথে মুসলমানদের যুদ্ধ করা ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। খ্রিস্টানদের আগ্রাসী তৎপরতা ও জুলুমের কারণে মুসলমানরা তাদের সাথে লড়াই করে। এ ঘটনাগুলোর কারণে মুতাহ্ ও হুদায়বিয়ার অভিযান পরিচালিত হয় আর শাম ও ইরাক জয় করা হয়।

বিশ্বের ভূ-খন্ডগত বিভাজন ও এর ফলশ্রুতিস্বরূপ স্থায়ী যুদ্ধাবস্থা বিভিন্ন ঘটনার জন্ম দিয়েছিল। তখনকার আব্বাসী খেলাফত ও বায়জেন্টাইন সাম্রাজ্যের মধ্যকার শত্রুতাপূর্ণ সম্পর্কই ভূ-খন্ডগত বিভাজনের কারণ। যে সব ফকীহ্ প্রাচীনপন্থী তত্ত্বের কথা বলেছেন তারা স্পষ্টতই প্রথম দিকের ইসলামী রাষ্ট্র ও আবিসিনিয়ার মধ্যকার সুসম্পর্ক এবং বায়জেন্টাইনীদের শত্রুতা আর নব্য ইসলামী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে তাদের মিত্রদের অবস্থান সম্পর্কে দৃষ্টিপাত করেননি। [৪৫] মুহাম্মদ আবু জাহরা প্রাচীনপন্থীদের বিরোধিতা করে বলেছেন :

> আমরা একটি মূলনীতি হিসেবে মুসলিম আইনতত্ত্বে এ (যেমন, দার আল ইসলাম ও দার আল হারব) বিভাজনের ব্যাপারে আপত্তি জানাই। আসলে আব্বাসী আমলের এ বিভাজন ইসলামী রাষ্ট্র ও অনৈসলামী রাষ্ট্রের মধ্যকার ঘটনা প্রবাহের কারণেই সম্ভব হয়েছে। প্রাচীনপন্থী লেখকগণ শুধুমাত্র ঐ অবস্থার একটি আইনগত যৌক্তিকতা প্রদর্শন করেছেন মাত্র। [৪৬]

ব্যক্তির বিশ্বাসের স্বাধীনতা

আমরা পূর্ববর্তী আলোচনায় বিশ্বের ভূ-খন্ডগত বিভাজনের ব্যাপারে প্রাচীনপন্থী তত্ত্বের বিপরীতে বলেছিলাম যে, ইসলাম প্রচারে এবং ইসলামী রাষ্ট্রসীমা সম্প্রসারণের জন্য যুদ্ধই একমাত্র পন্থা নয়। পূর্বের যুক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট প্রশ্নটির ব্যাপারে আমরা এখন

www.pathagar.com

আলোচনা করবো। ইসলাম কি ব্যক্তির চিন্তা চেতনার স্বাধীনতা বিশ্বাস করে? এর উত্তর 'হ্যাঁ' হয়ে থাকলে আবু বকর (রা) -এর আমলে যে মুসলমানগণ মুরতাদদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল তার বিষয়টি আমরা কিভাবে ব্যাখ্যা করবো?

প্রথম প্রশ্নের জবাব হবে 'হ্যাঁ'। কুরআনের দুটো আয়াতে বিশ্বাসের দ্ব্যর্থহীন স্বাধীনতা সম্পর্কে বিধৃত হয়েছে :

> ইহা যদি তোমার প্রভুর ইচ্ছা হয় আর জমিনে যারা আছে তারা যদি ঈমান এনে থাকে; তুমি কি তখন মানবজাতিকে বাধ্য করবে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিশ্বাস স্থাপন করাতে (১৯ : ৯৯)।

> দ্বীন সম্পর্কে জোর জবরদস্তি নেই; সত্য পথ ভ্রান্ত হতে সুস্পষ্ট হয়েছে (২ : ২৫৬)।

প্রথম আয়াতটি হিজরতের পূর্বে মক্কায় নাযিল হয়। আর পরেরটি নাযিল হয় হিজরতের পর মদীনায়। আল কুরতবী তাঁর আল জামিলি আহকাম আল কুরআন শীর্ষক কুরআনের তফসীরে উল্লেখ করেন যে, কোন কোন তফসীরকার সূরা তওবার আয়াতটিকে রদ করার কথা বলেছেন। এ আয়াতে মুসলমানদেরকে "কিতাবীদের" বিরুদ্ধে লড়াই করতে বলা হয়েছে। আবার অন্যেরা বলেন যে, এ আয়াতটি বাতিল বা রদ করা হয়নি। এ আয়াতের উপর আবু জাফরের ব্যাখ্যাকে আল কুরতবী এভাবে উদ্ধৃত করেছেন :

"ইসলামে কোন জবরদস্তি নেই, অর্থাৎ ইসলাম কবুলে কোন জোর প্রয়োগ করা যাবে না। দ্বীন শব্দের সাথে আল যোগ করা হয়েছে। এই দু'শব্দের মিলনের ফলে আলদ্বীন হয়েছে, যার অর্থ ইসলাম।[৪৭] হাদিস দ্বারাও এ মূলনীতি রদ করা যাবে না। হাদিসে বলা হয়েছে "জনগণের সাথে আমাকে লড়াই করতে বলা হয়েছে যে পর্যন্ত না তারা বলে : আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই," উপরে আলোচনা থেকে বুঝা যায় যে, হাদিসে একটি বিশেষ শাসনের (হুকুম খাস) কথা বলা হয়েছে। এ শাসন শরীকবাদীদের জন্যই শুধু প্রযোজ্য। তত্ত্বগতভাবে সাধারণ অর্থে হাদিসটিকে গ্রহণ করা হলেও এটিকে কুরআনের আয়াত রদ করার জন্য ব্যবহার করা যাবে না। পূর্বোক্ত হাদিসটি বহুলভাবে উদ্ধৃত হাদিস নয় (হাদিস আহাদ), সেজন্য এর বিষয়টি অনিশ্চিত (জান্নি আল দালালাহ) অবস্থার অন্তর্ভুক্ত। কুরআনের অন্যান্য আয়াতের ন্যায় এ আয়াতটি ব্যাপকভাবে উদ্ধৃত (মুতাওয়াতির), সেজন্য এর বিষয়টি নিশ্চিত (কাতি আল দালালাহ)।[৪৮]

বাতিল হওয়ার দাবী স্পষ্টতই ভুল। কেননা উভয় আয়াতই কঠিন শাসনে (মুহকাম) কথা বলে।[৪৯] প্রথম আয়াতটিতে দ্ব্যর্থহীনভাবে বলা হয়েছে যে, এটি আল্লাহর ইচ্ছা নয় যে, মানবজাতিকে জোরপূর্বক ইসলাম কবুলে বাধ্য করা হবে। দ্বিতীয় আয়াতটিতে বলা হয়েছে কোন মানুষকে ইসলাম কবুলে জোর প্রয়োগ করা যাবে না। "কেননা সত্য স্পষ্টই মিথ্যার উপরে।" আল্লাহর ইচ্ছা পরিবর্তিত হয় না আর এ জন্য সত্য স্পষ্টই সব সময় মিথ্যার উপরে। সেজন্য দু'টো আয়াতের কোনটাই বাতিলযোগ্য নয়।[৫০]

কিন্তু সাধারণ নিয়ম যদি এরূপ হয় যে, কাউকে জোরপূর্বক ইসলাম কবুল করানো যাবে না তাহলে মুরতাদদের ব্যাপারে (রিদ্দা) কি রকম ব্যবহার করা হবে?

www.pathagar.com

প্রাচীনপন্থী ফকীহদের মতে মুরতাদের শাস্তি মৃত্যুদন্ড। দু'টো বিষয়ের উপর ভিত্তি করে এই যুক্তি কাজ করে : আরব মুরতাদদের বিরুদ্ধে আবু বকর (রা) -এর নেতৃত্বে লড়াই করা হয়। হাদিসে আছে "তিনটি কারণ ছাড়া বৈধ পন্থায় একজন মুসলমানকে হত্যা করা যাবে না : ব্যভিচারকারী বিবাহিত ব্যক্তি; জানের বদলে জান, স্বধর্ম ত্যাগ এবং নিজ দল (জামাহ্) ত্যাগকারী।[৫১] এ কারণগুলো থাকলেই কেবল একজন মুসলমানকে হত্যা করা যেতে পারে।

মুরতাদদের ব্যাপারে আলোচনার সময় আমরা দু'টোর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারি। প্রথমত, যখন কোন জনগোষ্ঠী সমষ্টিগতভাবে কোন মুসলমান শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে আর ইসলামী আইন মানতে অস্বীকার করে, যেভাবে মুরতাদরা (মুরতাদুন) আবু বকরের সময়ে যাকাত দিতে অস্বীকার করে ও যাকাত সংগ্রহের বিরুদ্ধ শক্তিকে তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড় করায়। এরূপ মুরতাদদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে। তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে তাদের দ্বারা ইসলাম বাতিল করার জন্য নয় বরং ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও ইসলামী আইনের প্রতি তাদের অবাধ্যতার জন্য। তাদের বিরুদ্ধে যে লড়াই হবে তা হবে তাদের বিরুদ্ধে আইন প্রয়োগে বাধ্য করার লড়াই। দ্বিতীয়ত, মুসলমান শাসক কোন ব্যক্তির কাছ থেকে যাকাত আদায়ের ন্যায় অবশ্যকীয় দায়িত্ব পালন করবে না, তাদেরকে তা করতে বাধ্য করা হবে। বেশীর ভাগ ফকীহ'র মতে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা যাবে না বা তাদেরকে হত্যাও করা হবে না। তারা যখন প্রচন্ডভাবে মুসলমান শাসকদের বিরোধিতা করে আর মুসলমান শাসককে তাদের বিরুদ্ধে দায়িত্ব পালন করতে না দেয়, আইন অমান্য করে, কেবল তখনই তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে।[৫২] উল্লেখিত হাদিসে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, কোন ব্যক্তিকে মুরতাদ হওয়ার জন্য হত্যা করা হবে না। মুসলমান আর ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার কারণেই তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে। ব্যক্তিগতভাবে কেউ ইসলাম হতে খারিজ হয়ে থাকলেই তাকে হত্যা করা যাবে না। তার বিরুদ্ধে লড়াই বা তাকে হত্যা করা এর জন্য যথেষ্ট কারণ হিসেবে বিবেচিত হবে না। যখন কেউ ইসলাম ত্যাগ করে রাষ্ট্রের আইন লংঘন করে, রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে এটিকে ব্যবহার করে, ইসলামী আইনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, তখনই কেবল একজন মুরতাদের বিরুদ্ধে ইসলাম আর মুসলমান সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের জন্য হত্যার আদেশ বলবৎ করা যাবে।

মুরতাদের বিরুদ্ধে ইসলাম কবুলে জোর প্রয়োগ উদ্দেশ্য নয়, উদ্দেশ্য ইসলামী আইন প্রচলন ও আইন-শৃংখলা রক্ষায় ব্যবস্থা গ্রহণ। সেজন্য কোন ব্যক্তি যদি একাই শান্তিপূর্ণভাবে মুরতাদ হয়ে যায় আর জনগণের কোন ক্ষতির কারণ না হয় সে ইসলামী শাসকের কোন চিন্তার কারণ হবে না। সে যখন প্রকাশ্যে ইসলাম ত্যাগ করে ইসলামী আইন লংঘন করে তখন ইসলামী আইন লংঘনের জন্য, মুসলমানদের বিশ্বাস ও আদর্শের প্রতি হুমকি সৃষ্টি করার জন্য তাকে শাস্তি দিতে হবে; যখন কোন জনগোষ্ঠী মুসলিম শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, যেমন জনসাধারণের নামায আদায়ে সমস্যা সৃষ্টি

www.pathagar.com

করে, যাকাত প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির ধ্বংস সাধন করে কেবল তখনই ইসলামী শাসক তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারে। তবে কোন মুসলমান জনগোষ্ঠী যদি জনগণ কর্তৃক ব্যাপকভাবে গৃহীত কোন মতামতের বিরোধীতা করে বা কর্তৃপক্ষের কোন সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করে; সেজন্য তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা যাবে না, কেননা এই বিরোধীতা ইসলামের বিরোধীতা নয় বা এটি ইসলামী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কোন হুমকিও নয়। এ জাতীয় বিরোধীতা কোন মুসলমান জনগোষ্ঠী বা মুসলমানদের শত্রুদের দ্বারা তৈরী কোন বিরোধীতা নয়। খারিজীগণ (যাওয়ারায) যখন আলী ইবন আবু তালিব - এর বিরোধীতা করে এবং তাঁর কর্তৃত্ব মানতে অস্বীকার করে তখন তারা "কর্তৃত্ব একমাত্র আল্লাহরই" এই প্রচারণা চালাতে থাকে। আলী (রা) এর জন্য তাদের বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক কোন যুদ্ধ ঘোষণা করেননি। তাদেরকে তিনি তিনটি বিষয় করতে বলেছিলেন : "কাউকে মসজিদে যাওয়ার ব্যাপারে বাধা দিতে পারবে না। আগে থেকেই আক্রমণ করা যাবে না, যত দিন তারা আমাদের সাথে যুদ্ধ করেছে, তাদের পাওনা গণিমত গ্রহণ করতে অস্বীকার করবে না।" [৫৩] আল মাওয়ারদী বলেন, "কোন বিরোধী শক্তি কোন সঠিক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলে, কোন এলাকা নিয়ন্ত্রণ করলে, এই এলাকাকে তাদের একান্ত নিজস্ব এলাকা করে নিলে তাদের বিরুদ্ধে কোন যুদ্ধ করা যাবে না যে পর্যন্ত না তারা কারো অধিকার খর্ব করে বা সাধারণ বিধি বিধান ভংগ করে।" [৫৪]

যুদ্ধের উদ্দেশ্য

পূর্ববর্তী আলোচনায় আমরা দেখেছি যে, যুদ্ধের লক্ষ্য ইসলাম প্রচার নয় বা ইসলামী রাষ্ট্রের সম্প্রসারণ নয় বা রাজনৈতিকভাবে, সাময়িকভাবে অমুসলিম অঞ্চলের উপর আধিপত্য বিস্তার নয়। যুদ্ধের উদ্দেশ্য ছিল ন্যায় প্রতিষ্ঠা, অত্যাচার ও নিপীড়ন দূর করা। এটি সত্য যে, যেখানে ইসলামী নিয়ম-নীতি চালু আছে মুসলিম উম্মাহর এটি অবশ্য কর্তব্য যে, সেখানে ইসলামের প্রসার ও ইসলামী এলাকার বিস্তার ঘটানো। ইসলামী রাষ্ট্রের এটি একটি উদ্দেশ্য। তবে শান্তিপূর্ণ উপায় এবং বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে এ কাজটি করতে হবে। ন্যায় প্রতিষ্ঠা আর জুলুম নির্যাতন বন্ধ করা যুদ্ধের লক্ষ্য। "ন্যায় বিচার" আর "জুলুম" শব্দ দুটো ব্যাপক। বিরাট পরিসরে শব্দ দুটোর ব্যাখ্যা হতে পারে। শব্দ দু'টোকে আরও বাস্তব অর্থে ব্যবহার করতে হবে। আমরা পাঁচটি অবস্থার কথা বর্ণনা করতে পারি যেখানে ন্যায় বিচারের মূলনীতি লংঘন করা হয়। যখন সীমাহীন জুলুম করা হয় সেখানে এবং সে পরিস্থিতিতে ইসলামী রাষ্ট্র যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারে আর এরূপ পরিস্থিতিতে কোন রাজনৈতিক সত্তার বিরুদ্ধে হিংসাত্মক কাজের আশ্রয় নিতে পারে। পাঁচটি বিষয় নিম্নে বর্ণনা করা হলো :

১. নির্যাতনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ

মুসলমানদের উপর এটি অবশ্য কর্তব্য কোন রাজনৈতিক শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা, যারা রাষ্ট্রের জনগণের কাছে ইসলাম প্রচারে বাধার সৃষ্টি করে, স্বাধীনভাবে ইসলাম প্রচার আর ইসলাম পালনে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে।

www.pathagar.com

> তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকবে যাবত ফিতনা দূরীভূত না হয় এবং আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত না হয় ... (২ : ১৯৩)।
>
> তোমাদের কী হলো যে, তোমরা সংগ্রাম করবে না আল্লাহর পথে এবং অসহায় নর-নারী এবং শিশুদের জন্য? যারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! এই জনপদ যার অধিবাসী জালিম, তা হতে আমাদের অন্যত্র নিয়ে যাও; তোমার নিকট হতে কাকেও অভিভাবক কর এবং তোমার নিকট হতে কাকেও আমাদের সহায় কর (৪ : ৭৫)।

এটি এখানে সুস্পষ্ট করে বলতে হবে যে, কোন বিশেষ শাসকের শাসনকে ইসলামী আদর্শ আর নীতিমালার সাথে তুলনা করে নির্যাতনমূলক বলা যাবে না বরং মুসলমানরা এই নির্যাতনমূলক অবস্থাকে কতটুকু সহ্য করতে পেরেছে আর সাধারণ মানুষের কাছে ইসলামের দাওয়াত কতটুকু পৌঁছতে পেরেছে তার উপরই নির্যাতনের অবস্থাটা নির্ভর করবে। দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনাকে কোন বিশেষ শাসকের কৃত জুলুম হিসেবে গণ্য করা যাবে না আর সেজন্য তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে দেয়া যাবে না, কেননা শাসকের এ অবস্থাকে পুনর্মূল্যায়ন করা যেতে পারে। বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের মাধ্যমে, শিক্ষা ব্যবস্থা ও নৈতিক সংস্কারের মাধ্যমে সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তন আনয়ন করতে হবে। যখন শান্তিপূর্ণ উপায়ে তা সম্ভব না হয় এবং হিংসাত্মক পরিস্থিতির উদ্ভব হয় তখনই মাত্র সংশ্লিষ্ট শাসকের বিরুদ্ধে হিংসাত্মক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। উপরের অবস্থার আলোকে দেখা যায় যে, যে পর্যন্ত না শরীকবাদী আরবরা মুসলমানদেরকে নির্যাতন করেছে, তাদের জান-মালে ধ্বংস সাধন করেছে ততক্ষণ পর্যন্ত রাসূল (সা) তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেননি। রাসূল (সা) মদীনার ইহুদীদের বিরুদ্ধেও কোন যুদ্ধ ঘোষণা করেননি যে পর্যন্ত না তারা মুসলমানদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে আর মুসলমানদের শত্রুদের সাথে ষড়যন্ত্র করেছে। রাসূল (সা) বায়জেন্টাইনীদের বিরুদ্ধে এবং তাদের আরব মিত্রদের বিরুদ্ধে যারা রাসূল (সা) -এর দূতদের এবং ধর্ম প্রচারকদের হত্যা করেছিল তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। রাসূল (সা) -এর দূত ও ধর্মপ্রচারকগণ মানুষকে শান্তিপূর্ণভাবে ইসলামের দাওয়াত দিতে গিয়েছিলেন আর আল্লাহর ওহীকে তাদের কাছে পরিচিত করতে গিয়েছিলেন।

২. মুসলমানদের জান-মাল রক্ষায় যুদ্ধ

অন্য কোন রাজনৈতিক সম্প্রদায়ের কোন লোক যদি কোন মুসলমানকে নির্যাতন বা হত্যা করে থাকে, তার সম্পত্তি ডাকাতি বা অবৈধভাবে দখল করে থাকে, ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্ব হলো সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা তার পরিবারকে উপযুক্ত ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণ দানের ব্যবস্থা করা আর তার অধিকারকে সমুন্নত রাখার ব্যবস্থা করা। এ প্রবন্ধের ক্ষুদ্র পরিসরে ক্ষতিপূরণ দানের পদ্ধতি আলোচনা করা সম্ভব নয়, তবে এখানে এটি বলাই যথেষ্ট হবে যে, মজলুম মুসলমানদের প্রতি ইসলামী রাষ্ট্র তার হক প্রতিষ্ঠায় যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। যে রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষ এ জাতীয় আগ্রাসন সহ্য করেছে, যে রাজনৈতিক

www.pathagar.com

কর্তৃপক্ষ মুসলমানদের উপর কৃত অন্যায়কে সংশোধন করতে অস্বীকার করেছে, প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের যথেষ্ট সময় দেয়ার পরও তার প্রতিকারের কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি রাষ্ট্র ন্যায় প্রতিষ্ঠায় তার বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

> ... যে কেউ তোমাদেরকে আক্রমণ করবে তোমরাও তাকে অনুরূপভাবে আক্রমণ করবে এবং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রাখ যে আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে থাকেন (২ : ১৯৪)।

৩. বিদেশী শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ

বিদেশী আক্রমণের স্পষ্ট কথা হলো কোন ইসলামী রাষ্ট্র আর তার মিত্রদের বিরুদ্ধে সামরিক আক্রমণ। শত্রুরা আক্রমণ না করলে মুসলমানরা আক্রমণ করবে এর কোন প্রয়োজন নেই। মুসলমান রাষ্ট্র যদি এ ব্যাপারে নিশ্চিত হয় যে, শত্রু রাষ্ট্র পর্দার অন্তরালে আক্রমণের প্রক্রিয়া করছে এবং আক্রমণের জন্য সেনাবাহিনীর সমাবেশ ঘটাচ্ছে বা ইসলামী রাষ্ট্র বা এর প্রতিপক্ষের মধ্যে যুদ্ধাবস্থা সৃষ্টি করছে তখন মুসলমান রাষ্ট্র আগেভাগেই শত্রপক্ষের উপর আক্রমণ বা যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারে।

এমন কোন রাজনৈতিক সত্তার সাথে ইসলামী রাষ্ট্রের কোন মিত্রতা হয়ে থাকলে বা সামরিক সহায়তার জন্য কোন সন্ধি চুক্তি হয়ে থাকলে তখন চুক্তি রক্ষা করা, সামরিক সহায়তা দিয়ে প্রতিপক্ষকে সাহায্য করা হবে ইসলামী রাষ্ট্রের কর্তব্য। মক্কা বিজয়ের সময় কুরাইশরা অগ্রপশ্চাত চিন্তা না করে খুজা সম্প্রদায়ের উপর আক্রমণ করেছিল। খুজা ছিল মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রের একটি মিত্র পক্ষ। এভাবে তারা হুদায়বিয়ার সন্ধি ভংগ করেছিল। এ সন্ধির আওতায় খুজা সম্প্রদায়ের উপর আক্রমণ করার কথা ছিল না।[৫৫]

৪. আইন প্রয়োগের জন্য যুদ্ধ

কোন জনগোষ্ঠী ইসলামী রাষ্ট্রের সীমানায় বসবাস করে ইসলামী আইনের বিরোধীতা কররে বা ইসলামী রাষ্ট্রের ভূ-সীমানার প্রতি হুমকী সৃষ্টি করলে এই জাতীয় বিদ্রোহ দমনের জন্য মুসলমান শাসক সামরিক শক্তি ব্যবহার করতে পারে। একটি বিষয় এখানে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে যে, সরকারী কোন নিয়ম-নীতির বিরোধীতা এখানে বিবেচ্য বিষয় নয়। আসল ব্যাপার হলো সামরিক কায়দায় এমন কোন বিরোধী কাজ কর্ম করা যার ফলে সমাজের মানুষের জান-মালের উপর হুমকী সৃষ্টি হতে পারে। তিন ধরনের বিরোধীতাকে আমাদের আলাদাভাবে দেখতে হবে। এর মধ্যে দুটো কারণকে সামরিক শক্তি প্রয়োগ করে দমন করতে হবে। আর তৃতীয় মতবিরোধটা হলো বৈধ রাজনৈতিক বিরোধীতা। এটিকে শান্তিপূর্ণভাবে সমাধানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

ক. মুরতাদধর্মী কর্মকান্ড : মুসলমান রাষ্ট্রের ভেতরে কোন জনগোষ্ঠী যখন সে রাষ্ট্রের ভেতরে ইসলামের মৌলিক কোন আইন বা বিধিমালার বিরোধীতা করে, যেমন জামাতে নামায আদায়, যাকাত আদায় -এর ন্যায় বিষয়গুলোর বিরোধীতা করে তখন এটি হবে স্বধর্ম ত্যাগ বা মুরতাদের কাজ। তখন এ জাতীয় জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে

www.pathagar.com

হবে। এসব মুসলমান জনগোষ্ঠীর বিদ্রোহ দমন না হওয়া পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে। তবে এ ব্যাপারে স্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে যে, ইসলাম প্রচার না করার জন্য বা ইসলাম পালন না করার জন্য মুরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ নয়, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ হলো ইসলামী আইন পালন না করার জন্য। আল্লাহর প্রতি দায়িত্ব পালন ব্যক্তির নিজস্ব ব্যাপার, সেজন্য তাকে প্রশ্ন করা যাবে না বা অভিযুক্ত করা যাবে না। কেননা ব্যক্তি তার কৃতকর্মের জন্য আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করবে। মুসলমান সম্প্রদায়ের কাছে সে জবাবদিহি করবে না।

সরকারী দায়িত্ব পালন করার ব্যাপারে ব্যক্তিকে জবাবদিহি করতে হবে। যেমন, কেউ ব্যক্তিগতভাবে নামাযকে অবহেলা করলে তাকে কোন প্রকার শাস্তি দেয়া যাবে না যে পর্যন্ত না সে খোলাখুলিভাবে নামাযকে অস্বীকার করবে। জামাতে হাজির হওয়ার জন্য ব্যক্তির উপর জোর প্রয়োগ করা যাবে না, কেননা নামাযের জামাতে হাজির হওয়া তার নিজের ব্যাপার আর এটি তার নিজের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। তবে তাকে যাকাত দিতে জোর প্রয়োগ করা যাবে। মুসলমান শাসককে তার যাকাত দেয়ার যে কর্তব্য আছে তা পালন না করলে তাকে শাস্তি দেয়া যাবে। কেননা যাকাত কেবল ব্যক্তিগত কোন দায়িত্ব নয়। এটি একটি সরকারী দায়িত্বও বটে।

খ. বিদ্রোহ : যখন কোন মুসলমান জনগোষ্ঠী কোন মুসলমান এলাকার ভিতরে নিজেদেরকে শক্তিশালী করে আর যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জারীকৃত নিয়ম নীতি যথা নিয়মে পালনের ব্যাপারে অনীহা প্রকাশ করে, অস্বীকার করে, কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগ করে এবং সরকারী নীতির সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে না। এ ব্যাপারগুলোকে বিদ্রোহ বলা হবে। আর এরূপ বিদ্রোহের জন্য সংশ্লিষ্টের বিরুদ্ধে মুসলমান কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জোর প্রয়োগ করা যাবে। বিদ্রোহ দমনে শক্তি প্রয়োগ করা যাবে।

গ. রাজনৈতিক বিরোধীতা : যখন কোন মুসলমান জনগোষ্ঠী শান্তিপূর্ণভাবে কোন সরকারী নীতির বিরোধীতা করে, কোন নীতির ব্যবহারের বিরুদ্ধে কোন ফোরাম ব্যবহার করে অন্যান্য জনগোষ্ঠীকে তাদের মতামত গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে তখন এটি হবে রাজনৈতিক বিরোধীতা। এরূপ মতামত দমনে কোন সরকার শক্তি প্রয়োগ করতে পারবে না। বিরোধী দলের বিরোধীতার কারণে জনস্বার্থ খর্ব হতে পারে এমন আশংকার সৃষ্টি হলে মুসলমান শাসক আদালতের মাধ্যমে - এর বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে বা বিরোধীদের বিরুদ্ধে শূরা'র মাধ্যমে নিষেধাজ্ঞা জারী করা যেতে পারে বা অন্য যে কোন শান্তিপূর্ণ বৈধ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

শান্তি এবং যুদ্ধাবস্থা

ইসলামের শান্তি অর্থ ইসলামে কোন যুদ্ধ নেই তা নয় বরং শান্তি অর্থ হলো জুলুম আর নির্যাতনের অবসান। ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠিত হলেই ইসলামে প্রকৃত শান্তি অর্জন সম্ভব। যে শাসক মানুষকে তাদের আদর্শের চর্চা করতে দেয় না এবং তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী আমল করতে দেয় না ইসলাম সে শাসকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাকে যায়েজ করেছে। অমুসলমানরা

www.pathagar.com

ইসলাম প্রচারে বাধা না দিলে বা মুসলমানদের উপর জুলুম না করলে অমুসলমানদের উপর যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়া যাবে না। যারা মুসলমানদের প্রতি ভাল আচরণ করে তাদের প্রতি ইসলাম উত্তম আচরণের তাগিদ দিয়েছে। ইসলামী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যারা আগ্রাসন চালায় তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা যেতে পারে। সাইয়িদ কুতুব বলেন, এ জাতীয় আন্দোলন ইসলাম প্রচার আর ধ্যান-ধারণা ও বিশ্বাসের সংস্কারের জন্য পন্থা অবলম্বন করে থাকে। জাহিলী পদ্ধতির শাসক ও প্রতিষ্ঠানের বিলোপ সাধনে দৈহিক শক্তি আর জিহাদের মাধ্যমে এ আন্দোলন কার্যকর পদ্ধতি গ্রহণ করে। যে শাসক মানুষকে তার ধ্যান-ধারণা ও বিশ্বাসের চর্চা করতে দেয় না এ আন্দোলন তার বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করে।... [৫৬]

যে সকল প্রাচীনপন্থী ফকীহ্ দার আল ইসলাম ও দার আল হারব শীর্ষক দুটো ভাগ করেছেন তারা কোন পক্ষপাতিত্ব না করেই সকল অমুসলমান সম্প্রদায়কে একটি শ্রেণীতে ফেলেছেন আর তাদের বিরুদ্ধে স্থায়ী যুদ্ধাবস্থা ঘোষণার কথা বলেছেন, আর বলেছেন অমুসলমানদের সাথে বাধ্যবাধকতা না থাকলে শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করা যাবে না। [৫৭] আব্বাসী যুগে এ তত্ত্ব স্পষ্টতই মুসলমান আর অমুসলমানদের মধ্যে ঘটনাচক্রে যে সম্পর্ক সৃষ্টি হয়েছিল তা (ইসলামী উম্মাহর সব মূলনীতি আর প্রকৃতি লক্ষ্যসমূহ নির্ধারণে) ব্যর্থ হয়। ইবনে তাইমিয়া তাঁর গ্রন্থ আল সিয়াসাহ আল শারিয়া গ্রন্থে বলেছেন যে, অমুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ইসলামী রাষ্ট্রের লক্ষ্য নয়, তবে মুসলমানদের ধর্ম প্রচারের অধিকারকে যারা অস্বীকার করে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যাবে।

> ধর্মকে আল্লাহর জন্য আর আল্লাহর কথাকে সব কিছুর চেয়ে শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করার জন্য যুদ্ধের অনুমতি দেয়া যায়। যারা (যেসব মুসলমান আল্লাহর আইন পালনে) এর বিরুদ্ধে কাজ করবে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে। তবে নারী, শিশু, সন্ন্যাস, বুড়ো, অন্ধ, খোঁড়া বা এরকম অক্ষম তাদেরকে হত্যা করা যাবে না। বেশীর ভাগ পন্ডিতই এ মতামত ব্যক্ত করেছেন। কোন কোন পন্ডিত এমতও দিয়েছেন যে, সকল অবিশ্বাসীদেরকেই তাদের ধর্মবিরোধীতার কারণে হত্যা করতে হবে। তবে শিশু ও নারীদেকে হত্যা করা যাবে না কেননা তারা মুসলমানদের সম্পত্তি। [৫৮] প্রথম যুক্তিটাই গ্রহণযোগ্য ও সঠিক, কারণ তাদের বিরুদ্ধেই আমাদেরকে যুদ্ধ করতে হবে যারা আমাদেরকে আল্লাহর ধর্মের দিকে ডাকা থেকে বাধা দান করে। আল্লাহ বলেন, "যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তোমরাও আল্লাহর পথে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর; কিন্তু সীমালংঘন করো না। আল্লাহ সীমা লংঘনকারীগণকে ভালবাসেন না (২ : ১৯০)।
>
> ইবনে তাইমিয়া বলেন, "আল্লাহ শুধুমাত্র ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে মানুষ হত্যা করতে বলেছেন" সুতরাং যে কোন (অবিশ্বাসী) ব্যক্তি যে কোন মুসলমানকে আল্লাহর ধর্ম চর্চা করতে কোন বাধার সৃষ্টি করে না। তার অবিশ্বাস দ্বারা সে কাউকে আঘাত করে না, এ কাজের দ্বারা সে কেবল নিজের অন্তরকেই কষ্ট দেয়।" [৫৯]

www.pathagar.com

সকল অমুসলমানদেরকে একই শ্রেণীভুক্ত করে তাদের সবার বিরুদ্ধে স্থায়ী যুদ্ধাবস্থা ঘোষণা করে রাখা পুরোপুরি ভুল। এটি সত্য যে, ইসলামী রাষ্ট্র আর শত্রুরাষ্ট্রের মধ্যে যুদ্ধাবস্থা বিরাজ করতে পারে। তবে যুদ্ধাবস্থা ঘোষণার পূর্বে উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে শত্রুতার বিষয়টি স্পষ্ট হতে হবে। শত্রু আর শান্তিপ্রিয় মুসলমানদেরকে আলাদা করে ভাবতে হবে আর প্রত্যেকের সাথে সে অনুযায়ী আচরণ করতে হবে। আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল এবং তার সাহাবীদের দ্বারা দুনিয়ার মধ্যকার দুটো ভাগ নির্ধারণের পূর্বেই এ পার্থক্যটি নির্ধারণ করা হয়ে গিয়েছে। কুরআনের সূরা মুমতাহিনায় (আয়াত ৮-৯) এটি স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, সকল অমুসলমানরা এক শ্রেণীর নয়, তারা দু'ভাগে বিভক্ত। সেজন্য বিষয়টি আলাদাভাবে দেখতে হবে।

> দ্বীনের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে স্বদেশ হতে বহিষ্কৃত করেনি তাদের প্রতি মহানুভবতা প্রদর্শন ও ন্যায় বিচার করতে আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না। আল্লাহ ন্যায়পরায়ণদিগকে ভালবাসেন (৬০ : ৮)।
>
> আল্লাহ কেবল তাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করেন যারা দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করেছে, তোমাদেরকে স্বদেশ হতে বহিষ্কৃত করেছে এবং তোমাদের বহিষ্করণে সাহায্য করেছে। তাদের সাথে যারা বন্ধুত্ব করে তারা তো সীমালংঘনকারী (৬০ : ৯)।

নীতি ও কৌশলের মাঝে

পূর্বোক্ত আলোচনা মোতাবেক একটি প্রশ্ন উঠতে পারে যে, এসব পরিস্থিতিতে কি মুসলমানগণকে যুদ্ধ করতে হবে? পরিস্থিতি যাই হোক বা এটা শুধুমাত্র একটি বৈধ ব্যাপার বা পছন্দের ব্যাপার হয়ে থাকলে মুসলমানরা কি এরূপ পরিস্থিতিতে যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারে? এই প্রশ্নের উত্তরে মুসলমানদের উপর জিহাদের স্থায়ী যে বাধ্যবাধকতা রয়েছে আর বর্তমান মুহূর্তের অবস্থার নিরিখে জিহাদের পদ্ধতি কি হবে তা আমাদেরকে নির্ধারণ করতে হবে। আর এসব পরিস্থিতির মোকাবেলা জিহাদের সবচেয়ে সঠিক পদ্ধতি কি হবে তা নির্ণয় করতে হবে। অন্যভাবে বলতে গেলে মুসলিম উম্মাহকে জিহাদের মূলনীতিকে লালন করতে হবে আর এর চাহিদা মোতাবেক কাজও করতে হবে। জিহাদের মূলনীতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন একটি কৌশলগত ব্যাপার। জুলুম দূর করে মানবাধিকার সংরক্ষণ, মুসলমানদের সার্বভৌমত্ব রক্ষা, ইসলামী আইন মেনে চলা ইসলামী উম্মাহর উদ্দেশ্য। জিহাদের মূলনীতির মাধ্যমে মুসলমানদেরকে এসব লক্ষ্য অর্জন ও সংরক্ষণ করতে হবে। এসব লক্ষ্য অর্জন এবং জিহাদের মূলনীতির ধরনের সবচেয়ে যথাযথ পদ্ধতি হলো নেতৃত্ব ও কৌশল।

রাসূল (সা) -এর মক্কী জমানার পুরো সময়ে মুসলমানরা প্রতিপক্ষের সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান বজায় রেখেছিল। কুরাইশদের দ্বারা শারীরিক নির্যাতন ও মানসিক নির্যাতনের পরও তারা কোন প্রতিবাদ করেনি। শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখাই ছিল তখনকার জন্য

www.pathagar.com

মুসলমানদের লক্ষ্য হাসিলের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ পন্থা। [৬০] কেউ কেউ বলতে পারেন যে, মুসলমানরা মক্কী জমানায় কোন আক্রমণাত্মক ভূমিকা গ্রহণ করেনি, কেননা তাদের প্রতি তখন যুদ্ধের কোন অনুমতি ছিল না। এ জাতীয় যুক্তিকে সহজেই উল্টায়ে দেয়া যায় যখন আমরা দেখতে পাই যে, তখন মক্কী জমানায় আত্মরক্ষার মূলনীতির অভাব ছিল, যার কারণে তখন মুসলমানদের যুদ্ধের মূলনীতিকে সাময়িক সময়ের জন্য স্থগিত করে রাখা হয়েছিল। যুদ্ধের মূলনীতি বা অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার বিষয়টিকে একেবারে বাদ দিয়ে দেয়া হয়নি। কুরআন দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করেছে যে, আত্মরক্ষার এবং সামরিক বশ্যতা স্বীকারের মূলনীতি সামাজিক জীবন ও মৌলিক নীতির অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। কুরআনের এ নীতির উপর ভিত্তি করেই মানব সভ্যতার বিবর্তন ঘটেছে।

> ... আল্লাহ যদি মানবজাতির একদলকে অন্য দল দ্বারা প্রতিহত না করতেন তবে পৃথিবী বিপর্যস্ত হয়ে যেত। কিন্তু আল্লাহ বিশ্বজগতের প্রতি অনুগ্রহশীল (২ : ২৫১)।
>
> আল্লাহ যদি মানব জাতির এক দলকে অন্য দল দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তা হলে বিধ্বস্ত হয়ে যেত। খ্রিস্টান সংসার বিরাগীদের উপাসনা স্থান, গীর্জা ইহুদীদের উপাসনালয় এবং মসজিদসমূহে যাতে অধিক স্মরণ করা হয় আল্লাহর নাম (২২ : ৪০)।

জিহাদের আগে মুসলমান নেতাদের বিরাজমান অবস্থা, পরিবেশ, মুসলমান সম্প্রদায়ের ক্ষমতা নিরূপণ করে দেখতে হবে। এক সময় দেখা যাবে মানুষকে উদ্বুদ্ধকরণ ও শান্তিপূর্ণ অবস্থানের মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহর লক্ষ্য অর্জনে জিহাদই হবে সবচেয়ে কার্যকর উপায়। রাসূল (সা) -এর মক্কী জীবনে এ উপায় অবলম্বন করেই ফল পাওয়া গিয়েছিল। আবার অন্য উপায়ের মধ্যে উম্মাহকে শক্তিশালীকরণ আর প্রতিরক্ষামূলক কৌশল অবলম্বনই হবে এসব লক্ষ্য হাসিলের উত্তম উপায়। খন্দক যুদ্ধের সময় একই পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছিল। তৃতীয় পন্থায় মুসলমান নেতৃত্ব সিদ্ধান্ত নেবেন যে, সর্বাত্মক যুদ্ধই হবে ইসলামী রাষ্ট্রের লক্ষ্য অর্জনে সবচেয়ে উত্তম পন্থা। আরব মুরতাদদের বিরুদ্ধে এরূপ সর্বাত্মক যুদ্ধ চালনা করা হয়েছিল।

জিহাদের জন্য যে পদ্ধতির অবলম্বন করা হবে তা কিন্তু কোন খেয়ালখুশির সিদ্ধান্ত নয়। জিহাদ ঘোষণার জন্য মুসলমান সম্প্রদায় ও বিপরীত পক্ষের সাধারণ অবস্থাকে বিবেচনায় আনতে হবে। মুসলমান ও শত্রুপক্ষের সামরিক শক্তি এবং মুসলমান বাহিনীর মনোবলের বিষয়টিও বিবেচনায় আনতে হবে। কুরআন শত্রপক্ষের মোকাবেলায় মুসলমানদের ক্ষমতাকে তাদের জনশক্তির বিচারে সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন পর্যায়ে দুটো অনুপাতে (একের বিপরীতে দশ আর একের বিপরীত দু') ভাগ করেছে।

> হে নবী! মুমিনদেরকে সংগ্রামের জন্য উদ্বুদ্ধ কর; তোমাদের মধ্যে কুড়ি জন্য ধৈর্যশীল থাকলে তারা দু'শ জনের উপর বিজয়ী হবে এবং তোমাদের মধ্যে একশত জন্য থাকলে এক সহস্র কাফিরের উপর বিজয়ী হবে। কারণ তারা এমন এক সম্প্রদায় যার বোধশক্তি নেই (৮ : ৬৫)।

www.pathagar.com

> আল্লাহ এখন তোমাদের ভার লাঘব করলেন। তিনি অবগত আছেন যে, তোমাদের মধ্যে দুর্বলতা আছে, সুতরাং তোমাদের মধ্যে একশত জন ধৈর্যশীল থাকলে তারা দু'শত জনের উপর বিজয়ী হবে। আর তোমাদের মধ্যে এক সহস্র থাকলে আল্লাহর অনুজ্ঞাক্রমে তারা দু'সহস্রের উপর বিজয়ী হবে। আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন (৪ : ৬৬)।

কুরআনের এ আয়াতগুলোতে বলা হয়েছে যে, অনুকূল পরিবেশ ও উচ্চ মনোবল থাকলে ঈমানের ক্ষমতাবলে মুসলমানগণ দশের বিপরীতে একজনেই বিজয়ী হবে। কিন্তু মুসলমানদের সংগঠন আর অস্ত্রশস্ত্র দুর্বল হলে, সর্বোচ্চ মনোবল না থাকলে তারা তখন একজনে দু'জনের বিরুদ্ধে লড়তে পারবে না। প্রথম অবস্থা পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, বদর যুদ্ধের সময় মুসলমান বাহিনী, শত্রুপক্ষের তিনগুণ বিশাল বাহিনীর বিরুদ্ধে জয়ী হয়েছিল। দ্বিতীয় অবস্থাটি দেখা যায়, খন্দকের যুদ্ধের সময় মুসলমানগণ তাদের চেয়ে বহুগুণ শক্তিশালী শত্রুপক্ষের মোকাবেলা করেছিল। তখন তাদের শহরকে রক্ষার জন্য তারা মদীনার চারদিকে গর্ত খুঁড়েছিল আর এভাবে শত্রুপক্ষের সামরিক বাহিনীর মোকাবেলা থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে ছিল।[৬১]

উপসংহার

যুদ্ধ ও শান্তির প্রাচীনপন্থী তত্ত্ব ব্যাপক কোন তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেনি। তত্ত্বটি আব্বাসী ও বায়জেন্টাইনীদের সময়ে ঐতিহাসিকভাবে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলোর কথা বলে থাকে আর বিশেষ ঐতিহাসিক প্রয়োজনে গৃহীত নিয়মনীতির বিষয়গুলোর বর্ণনা এ সময়ে পাওয়া যায়। যুদ্ধ ও শান্তির ব্যাপক তত্ত্বের অভাবে যুদ্ধের ভূমিকা এবং ইসলামী বনাম অমুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যকার প্রকৃত লক্ষ্য অনুধাবনে অনেকগুলো ভ্রান্তির অবতারণা করেছে।

প্রাচীনপন্থী তত্ত্বে ভুলক্রমে যুদ্ধকে ইসলামী রাষ্ট্রের অস্ত্র হিসেবে মুসলমান ভূ-খন্ড বৃদ্ধি করা আর অমুসলমানদের উপর আধিপত্য বিস্তারের জন্য অস্ত্র হিসেবে দেখানো হয়েছে। এ প্রবন্ধে ন্যায় প্রতিষ্ঠায় ও জুলুম নির্যাতনের অবসানের জন্য যুদ্ধের প্রয়োজনীয়তার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। উদ্বুদ্ধকরণ ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে ইসলামের বিস্তার ঘটাতে হবে। কোন ধরনের বল প্রয়োগ আর বাধ্যবাধকতার মাধ্যমে নয়, শান্তিপূর্ণ পন্থা ব্যর্থ হলেই যুদ্ধের পথ বেছে নিতে হবে। এরপরও ইসলামে যুদ্ধ ছাড়া শান্তি আসতে পারে না। কেননা ইসলাম মনে করে ন্যায় প্রতিষ্ঠা হলেই প্রকৃত শান্তি আসবে। সেজন্য ইসলাম ঐ সব শাসকের বিরুদ্ধে যুদ্ধের কথা বলে যাদের কারণে মানুষ তাদের নিজস্ব আদর্শ নির্বাচন করতে পারে না বা তারা তাদের ধর্ম মত চর্চা করতে পারে না।

যুদ্ধ ও শান্তি, যুদ্ধ শুরুর বিভিন্ন বিষয়ে এখানে যে আলোচনা করা হয়েছে সেগুলোসহ যুদ্ধ পরিচালনা এবং শান্তির বিভিন্ন পন্থা যেমন সন্ধিচুক্তি, যুদ্ধবন্দী, যুদ্ধে প্রাপ্ত গণিমত - এর ন্যায় বিষয়েও এরূপ আলোচনা হতে পারে। এ নিয়মনীতিগুলোর বেশীর ভাগই ঐতিহাসিকভাবে তখনকার প্রচলিত নিয়ম ও ঐতিহ্যের সাথে সংশ্লিষ্ট। সেজন্য এগুলোর ব্যবহারও ঐতিহাসিকভাবেই সীমাবদ্ধ।

www.pathagar.com

পাদটীকা

* লুই এম সাফী, ডেট্রয়েটের ওয়েন স্টেট ইউনিভার্সিটির প্রফেসর। এই প্রবন্ধটি ইন্ডিয়ানার প্লেনফিল্ড -এ অনুষ্ঠিত Association of Muslim Social Scientist দের ষোড়শ বার্ষিক সম্মেলনে উপস্থাপন করা হয়। এ প্রবন্ধের শ্রেষ্ঠত্বের জন্য প্রবন্ধকারকে স্বীকৃতস্বরূপ ২০০.০০ মার্কিন ডলার পুরস্কার দেয়া হয়।

১. Mohammad Tallat al Ghunaimi. *The Muslim Conception of International law and the Western Approach* (Netherlands : Martinus Nijihoff / the Hague, 1399 / 1978) পৃ. ১৫৬; and Ibn Rushd. "Chapter on Jihad," in *Badayah al Mujtahid wa Nihayah al Muqtasid;* অনু. Ruddolph perters in *Jihad in Medaeval and Modern Islam* (Belgium : E.J. Brill, হিঃ ১৩৯৮ / ১৯৭৭ খ্রিঃ), পৃ.২৪.

২. মুহাম্মদ আবু জাহরা, মাহমুদ শ্যালটাউট, মুহাম্মদ আল গুনাইমি'র ন্যায় সমসাময়িক লেখকগণ এ মতবাদের সমালোচনা করেছেন।

৩. Religion is the translation of the Arabic Term of Din which also connotes judgement, liability, compliance and indebtedness.

৪. আল দ্বীনের অর্থ ধর্ম। এর দ্বারা ন্যায় বিচার, দায়বোধ, আনুগত্য ও আত্মসমর্পণকে বুঝানো হয়েছে।

৫. Zakiyy al Din al Mundhimri, de., *Mukhatasar Sahih Muslim.*edited by Nasir al Din al Albani, 2nd ed. (Al Maktab al Islami wa Dar al Arabiyyah, 1932/1983). পৃ. ৮

৬. Ibn Rushd. পৃ. ২৪

৭. Muhammad Ibn Jarir al Tabari, *Tafsir al Tabari* (Cairo : Dar al Maarif. n.d.) খন্ড ৩, পৃ. ৫৭২-৭৪; and Fakur al Din al Razi, *Al Tafsir al Kabir* (Cairo : Abd Rahim Muhammad, 1938) খন্ড ৫, পৃ. ১৪৫;

৮. কোরআনের ২ : ১৯৪ নং আয়াতেও এর অর্থ পাওয়া যায়। "... তোমাদেরকে আক্রমণ করলে তোমরাও আক্রমণ করবে।"

৯. Muhammad Ibn Ahmad al Qurtubi, *Jamu 'Ahkam al Quran* (Cairo : Matba'ah Dar al Masriyyah, ১৩৫৪ হিঃ / ১৯৩৫ খ্রিঃ), খন্ড ২, পৃ.৩৪৮

১০. প্রাগুক্ত

১১. ইসলামী আইন অনুযায়ী অন্যান্য সাক্ষ্য-প্রমাণের অভাবে (*কারাইন*) মূল বক্তব্যের মাধ্যমে যে অর্থটা (*ইবারাহ আল নাস*) বুঝানো হয়েছে তা ইশারা (*ইশারাহ*), তাৎপর্য (*দালালাহ*) বা মূল বক্তব্যের মুকতাদাহ'র চেয়ে স্পষ্ট। পূর্বের ব্যাখ্যা সেজন্য অস্পষ্ট এবং প্রশ্নের অবতারণা করতে পারে। কেননা এ ব্যাখ্যা বেঠিকভাবে আয়াতের সরাসরি অর্থকে বাতিল *(tuattil)* করে দেয়। দেখুন Abd al Wahhad Khallar, Ilm *Usul al Fiqh* (Al dar al Kuawaytiyyah, হিঃ ১৩৮৮ / ১৯৬৮ খ্রিঃ). পৃ. ১৪৩-৫৩ and Abd al Malik Ibn Abdullah al Juwayni. *Al Burhan fi Usul al Fiqh,* ed. *Abd al Aziz al* Dib (Cairo Dar al Ansar, হিঃ ১৪০০ / ১৯৭৯ খ্রিঃ), খন্ড ১, পৃ. ৫৫১

১২. Al Tabari. Tafsir, খন্ড ৩. পৃ. ২৮৫.

www.pathagar.com

১৩. আবু হানিফা, আল-শাফিঈ ও মালিক আরব পৌত্তলিকদেরকে অনারব বহুশ্বেরবাদীদের থেকে আলাদাভাবে দেখেছেন আর বলেছেন সূরা তওবার আয়াতগুলো আরব পৌত্তলিকদের বেলাতেই প্রযোজ্য। দেখুন, Ali Ibn Muhammad al Mawardi. *Al Ahkam al Sultaniyyah* (Cairo : Dar Fikr, হিঃ ১৪০৪ / ১৯৮৩ খ্রিঃ), পৃ. ১২৪; Inb Rushd পৃ. ২৪; and Muhammad Ibn Idris al Shafiri. *Al Risalah,* ed Ahmad Shakir (n.p.,হিঃ ১৩০৯ / ১৮৯১ খ্রিঃ). পৃ. ৪৩০-৩২

১৪. Khallaf. পৃ. ১৯১.

১৫. Al Mundhiri পৃ. ৯

১৬. Abu Yusuf, *kitab al Kharaj* (Cairo : Al Tiba'ah al Muniriyyah. ১৩৯৭ হিঃ / ১৯৭৬ খ্রিঃ). পৃ. ৯.

১৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৯

১৮. Ibn Rushd. পৃ. ২৩-২৪

১৯. যেমন, "কিতাবী জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে" যুদ্ধ কর যে পর্যন্ত না তারা জিয্য়া পরিশোধ করে ... বা অন্য যে কোন কথা যাতে সার্বিকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে "কিতাবী জনগোষ্ঠী" যেমন, বাক্যটির গঠন হওয়া উচিৎ ছিল "তাদের বিরুদ্ধে লড়াই কর..." বা "কিতাবী জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর" যারা ... "কিতাবী জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর" ... । এখানে 'মিন' -কে আরবী ভাষায় 'র' দিয়ে অনুবাদ করা হয়েছে, বিশেষভাবে বুঝানোর জন্য এবং একটি গোষ্ঠীকে আরেকটি গোষ্ঠী থেকে আলাদাভাবে বুঝানোর জন্য এটা করা হয়েছে। দেখুন, al-Juawayni. খন্ড-১, পৃ. ১৯১ ।

২০. Al Mawardi. পৃ. ১২৪

২১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৫-২৬

২২. Kamil Salamah al Daqs. *al Ilaqar al Dawliyyah fi al Islam* (Jeddah : Dar al Shuruq, 1396 / 1976). পৃ. ৩০২

২৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০২

২৪. প্রাগুক্ত, citing *Tarikh al Tabari.* খন্ড ৩, পৃ. ২৩৬

২৫. Al Daqs. পৃ. ৩০৩. *citing al Buldan.* পৃ. ১৬৬

২৬. Al Daqs পৃ. ৩০৮.

২৭. প্রাগুক্ত, Rushd. পৃ. ১১ : Majid Khadduri, *War and Peace in the law of Islam* (N.Y. : AMS Press, ১৪০০ হিঃ / ১৯৭৯ খ্রিঃ), পৃ. ২৫৬ : and Fathi al Ghayth. *Al Islam Wal Habashah Abra al Tar Ikh* (Cairo : Maktabah al Nahdah al Masriyyah, n.d.), পৃ. ৫৭. citing *Sirah al Halabiyah;* খন্ড ৩. পৃ. ২৯৪.

২৮. T.W. Arnold. *the Preaching of Islam* (London : Constable and Company, ১৩৩২ হিঃ / ১৯১৩ খ্রিঃ),পৃ. ১১৩.

২৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩-৪ : Muhammad Haykal. *The life of Muhammad.* trns. Ismail al Faruqi (North American Trust Publication. ১৩৯৭ হিঃ / ১৯৭৬ খ্রিঃ). পৃ. ৯৭-১০১; and Ibn Hisham. *Sirat Ibn Hisham. in Mukhtasar Sirah Ibn Hisham.* ed. Abdal Salam Harun (Beirut) al maja al 'Ilmi' al Islami, n.d.). পৃ. ৮১-৮৭.

www.pathagar.com

৩০. ইসলামের প্রথম যুগে মুসলমান ফকীহ্গণ যে ভূ-খন্ডে ইসলামী আইন প্রয়োগ করা হবে সেটাকেই *দার আল-ইসলাম* বলেছেন। দেখুন, আল ডাকস্, পৃ: ১২৬-১২৮, খাদ্দুরী, *War and Peace,* পৃ: ৬২; এবং গুনায়মি ১৫৫-৮। আল শওকানী'র ন্যায় কোন কোন ফকীহ্ *দার আল ইসলাম* বলতে যে ভূখন্ডে মুসলমানগণ নিরাপদে বসবাস করতে পারবে তাকে বুঝায়েছেন। "ভূ-খন্ডটি মুসলমান শাসনের অধীনে না থাকলেও সমস্যা হবে না।" - আল-গুনায়মি পৃ: ১৫৭-৫৮,

৩১. Ibn al Athir, *Al Kamil fi al Tarikh* (Cairo : Al Tiba'ah al Muniriyyah, ১২৮৯ হিঃ / ১৯৩০ খ্রিঃ), প্রাগুক্ত, ২. ১৪৫.

৩২. Zahir Riyad, *Al Islam fi Ethyubiya.* (Cairo : Dar al Ma'rifah, ১৩৮৪ হিঃ / ১৯৬৪ খ্রিঃ), পৃ. ৪৬

৩৩. পত্রটিতে লেখা ছিল : পরম দয়ালু ও দাতা আল্লাহর নামে, মুহাম্মদ তাঁর রাসূল (সা)। আপনার উপর, আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক, আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই যিনি আমাকে ইসলামে দাখিল করিয়েছেন। আপনার পত্র আমি পড়েছি। আপনি যীশু সম্পর্কে যা বলেছেন ঠিকই বলেছেন। তিনিও একই কথা বলেছেন। দুনিয়া ও আখিরাতের প্রভুর উপর আমি ঈমান আনলাম, আপনার উপদেশ আমি গভীর মনোযোগের সাথে গ্রহণ করেছি ...। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি আল্লাহর রাসূল। জাফরের সামনে আমি এই শপথ গ্রহণ করেছি আর তাঁর সামনেই আমি ইসলাম কবুল করেছি। বিশ্বজগতের প্রভুর আমি ইবাদত করি। মিশনের প্রতি সম্মানের অংশ হিসেবে এবং আমি আমার পুত্রকে দূত হিসেবে আপনার কাছে পাঠালাম আমি স্বীকার করছি যে, আপনার কথা সত্য (খাদ্দুর থেকে গৃহীত : *War and Peace,* পৃ: ২০৫-২০৬)

৩৪. Ibn Hisham, পৃ. ২১৪-১৫ : and Haykal, পৃ. ৩০০-৩০২.

৩৫. Ibn Hisham, পৃ. ২৫৬-৬০ : and Haykal, পৃ. ২৪৬-৫৪.

৩৬. Ibn Hisham, পৃ. ১৪০ : and Haykal, পৃ. ১৮০.

৩৭. Ibn Hisham, পৃ. ১৪২ : and Haykal, পৃ. ১৮১.

৩৮. Haykal, পৃ. ১৯১-৯৩

৩৯. Ibn., পৃ. ২৪৪-৪৫ : and Ibn Hisham. পৃ. ১৭৫.

৪০. Haykal, পৃ. ৩০০-৩০১ : and Ibn Hisham. পৃ. ২১৪.

৪১. Haykal, পৃ. ২৮৪ : and al-Daqs. পৃ. ২৮৭.

৪২. Al-Daqs. পৃ. ২৮৭.

৪৩. Haykal, পৃ. ২৮৭.

৪৪. Al-Daqs. পৃ. ২৮৭-২৮৮ Ibn Taymiyah থেকে "Risalah al Qital" *Majmuah al Rasail al Najdiyah.* পৃ ১২৭-৮.

৪৫. Al-Daqs. পৃ. ১২৯-১২৮.

৪৬. Muhammad Abu Zahrah, *Al llaqat at dowfiyah fi al Islam* (Cairo : ১৩৮৪ হিঃ / ১৯৬৪ খ্রিঃ), পৃ. ৫১. quoted in al Ghunaimi. পৃ. ২০২

৪৭. Al Qurtubi প্রগুক্ত, ৫. পৃ. ৪০৭-১২.

www.pathagar.com

৪৮. যখন নিশ্চিত (*কার্তি*) আর অনিশ্চিত *(জান্নি)* এর মধ্যে কোন অসামঞ্জস্যতা বিরাজ করলে নিশ্চিত (*কার্তি*) অবস্থাটাই গৃহীত হয়। আল শাব্দিল ও ইবনে তাইমিয়া'র ন্যায় ফকিহদের বক্তব্য হলো কুরআনের একটি আয়াতকে কুরআনের আরেকটি আয়াত দ্বারা বাতিল করা যায়। দেখুন, আল শরীফ, পৃ: ১০৬-১০৭; এবং শাহ ইবনে আবদ আল আজীজ আল মানসুর কৃত উসুল আল ফিকহ ওয়া ইবন তাইমিয়া (১৪০০ হিঃ / ১৯৮০ খ্রিঃ), খন্ড ১, পৃ. ২২৭ এবং খন্ড ২, পৃ. ৫৩৩

৪৯. মুসলমান ফকীহ্গণ কঠিন শাসনকে (*মুহকাম*) একটি বিবরণ হিসেবে ধরেছেন যার অর্থ স্পষ্ট এমন দ্ব্যর্থহীন, এটিকে explication de texte (*তা'ওয়িল*) বলা হয়। দেখুন, খাল্লাফ, পৃ. ১৬৮

৫০. ইসলামী আইন অনুসারে কঠিন আইন (*মুহকাম*) বাতিলের বিষয় নয়; দেখুন, খাল্লাফ, পৃ. ১৬৮। আল্ গাজালীর বক্তব্য হলো, যে আয়াতগুলো ইসলামের আইনগত ও ব্যবহারিক বিষয়গুলোর সাথে সংশ্লিষ্ট (*হুকুম শারঈ*) সেই আইনই বাতিল করা যেতে পারে। যে আয়াতগুলো সাধারণ আইনের সাথে সংশ্লিষ্ট (*হুকুম আকলি*) সেগুলো বাতিল করা যাবে না। দেখুন, আবু হামিদ আল গাজালী, আল মুসতাসফা ফি ইলম আল উসুল (কায়রো : আল মাতবাহ আল আমিরীয়া ১৩২২ হিঃ/১৮০৪ খ্রি.)

৫১. Yahya Ibn Sharak al Din al Nawai, *Forty Hadith.* trans. Ezzeddin Ibrahim and Denys Johnson (Beirut : Dar al Karim. ১৩৮৬ হিঃ / ১৯৭৬ খ্রিঃ). পৃ. ৫৯.

৫২. Al-Mawardi. পৃ. ১৯২.

৫৩. Al-Mawardi. পৃ. ৫৩.

৫৪. প্রাগুক্ত পৃ. ৫৩

৫৫. Haykal, পৃ. ৩৯৭; and Ibn Hisham. পৃ. ২৭৭.

৫৬. Sayyid Qutab, *Milestones* (Cedar Rapids, Iowa : Unity Publishing Co., n.d.), পৃ. ৫৫.

৫৭. Majid Khadduri, *The Islamic Law of Nations: Shaybani Siyar* (Baltimore, Maryland : The Johns Hopkins Press, ১৩৮৬ হিঃ / ১৯৬৬ খ্রিঃ), পৃ. ১৫৪ : and Ibn Rushd. পৃ. ২২.

৫৮. নারী ও শিশুদেরকে মুসলমানদের সম্পত্তি হিসেবে যেভাবে উল্লেখ করা হয়েছে ইসলামী ভাবধারা অনুসারে সেটা মানব মর্যাদাকে সমুন্নত করেনি। ইসলামী আইনে যুদ্ধবন্দীদেরকে দাস বানানোর প্রক্রিয়াকে রাসূল (সা) -এর সময়ে আর অনারব সব দেশের জন্যই প্রচলিত প্রথা হিসেবে মেনে চলা হয়। এরপর অবশ্য এটাকে আর তেমনভাবে গুরুত্ব দেয়া হয়নি। অপরপক্ষে দেখা যায়, কিছু কিছু মানবিক অধিকার দিয়ে দাসদেরকে শুধুমাত্র "সম্পত্তির" অবস্থা থেকে মর্যাদা দেয়া হয়। তাছাড়া দাসদেরকে সুবিধা দেয়ার জন্য আরও অনেকগুলো নিয়ম প্রবর্তন করা হয়। যেমন দাসমুক্তির জন্য মুকাতাবাহ (দাসমুক্তির জন্য কারো প্রভুর সাথে চুক্তি করা), কাফারাহ (প্রায়শ্চিত্ত করা) চালু করা হয়। যুদ্ধবন্দিদের সাথে আচরণের জন্য কুরআন দু'টো পদ্ধতির কথা বলেছে : দলকে মুক্তিপণ দিয়ে মুক্ত করা বা অনুগ্রহ হিসেবে মুক্ত করে দেয়া বা শুভেচ্ছাস্বরূপ মুক্ত করে দেয়া : "... যখন তোমরা তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করবে তখন তাদেরকে কষে বাঁধবে ; অতঃপর হয় অনুকম্প, নয় মুক্তিপণ। তোমরা জিহাদ চালাবে যতক্ষণ নয় যুদ্ধ এর অস্ত্র নামিয়ে ফেলে ..." (৪৭ : ৪)। যুদ্ধ বন্দীদেরকে দাস হিসেবে গ্রহণ করার নিয়মকে মুসলমানদের জন্য বাধ্যবাধকতা

www.pathagar.com

নয়। তবে শরীয়তে এটিকে যায়েজ বলা হয়েছে এবং ইসলামের জন্য ক্ষতিকর মনে হলে মুসলমানরা তা পরিহার করতে পারে।

৫৯. Ibn Taymiyah, *Al Siyasah al Shariyh* (Dar al Katib Al Arabi, n.d.). পৃ. ১৩১-১৩২

৬০. Qutb. পৃ. ৬৫-৬৭

৬১. Haykal পৃ. ৩০৩; and Ibn Hisham, পৃ. ২১৫.

নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি

১. আরবি

Abu Yusub. Kitab al Kharaj. Cairo : Al Tiba'ah al Muniriyyah, ১৩৯৭ হিঃ/১৯৭৬ খ্রিঃ.

al Daqs, Kamil Salamah, *Al Ilapat al Dawliyyah al Islam.* Jiddah : Dar al Shuruq. ১৩৯৬ হিঃ/১৯৭৬ খ্রিঃ.

al Ghazzali, *AbuHamid. Al Mustafa fi Ilm al Usul.* Al Matba'aah al Aminyyah ১৩১১ হিঃ/১৯০৪ খ্রিঃ.

Al Ghayth, Fathi, *Al Islam wa al Habasha abra al Tarikh.* Cairo : Maktabah al Nahadah al Masriyyah, n.d.

Al Nahdah al Masriyyah, n.d.

Ibn al Athir *Al kamil fi al tarikh* Cairo : Al Tibaah al Muniriyyah, ১৩৪৯ হিঃ.

Ibn Hisham. *Sirah Ibn Hisham, In Tahdhib sirah Ibn Hisham,* edited by Abd al Salam Harun. Beirut : Al Majma' al 'Ilmi al' Arabi al Islam, n.d.

al juwayni, Abd at Malik Ibn Abdullah. *Al Burhan fi Usul al Fiqh,* edited by 'Abdal' Aziz at Dib. Cairo : Dar al Ansar, ১৪০০ হিঃ / ১৯৮০ খ্রিঃ.

Ibn Taymiyyah, *Al Siyasah al Shariyyah,* Dar al Katib al Arabi, n.d.

Khallar, Abdal Wahhabd, *'Ilm Usul al Fiqh,* Al Dar al Kuwaay-tiyyah, ১২৮৮ হিঃ / ১৯৬৮ খ্রিঃ.

Al Mansur, Slah Ibn 'Abdul Aziz. *Usul al Fiqh wa Ibn Taymiyah. n.p.,* ১৪০০ হিঃ / ১৯৮০ খ্রিঃ.

Al Mawardi, Ala ibn Muhammad. Al Ahkam al Sultaniyyah. *Cairo : Dar al* ১৪০৪ হিঃ / ১৯৮৩ খ্রিঃ.

Al Mundhiri, Zakki al Din, ed. Mukhtasar Sahin, Muslim, edited by Nasir al Din al Albani, 2nd ed. Al Maktab al Islami wa Dar al Arabiyyah. ১৩৯২ হিঃ / ১৯৭২ খ্রিঃ.

al Qurtubi, Muhammad ibn Ahmad. *Jami Ahkam al Quran* Cairo : Matbaah Dar al Kutub al Masriyyah, ১৩৫৪ হিঃ / ১৯৩৫ খ্রিঃ.

al Razi, Fakhr al Din. *Al Tafsir al Kabir.* Cairo : Abdal Rahim Muhammad. ১৩৫৭ হিঃ / ১৯৩৮ খ্রিঃ.

Riyad, Zhir. *Al Islam fi Ethyubiya,* Cairo : Dar al Marifah, 1964.

al Tabari, Muhammad Ibn Jarir, *Tafsir al Tabari,* Cairo : Dar al Maafif.

Al Shafi'i, Muhammad Ibn Idris. *Al Risalah* edited by Ahmad Shakir, N. p., ১৩০৯ হিঃ / ১৮৯১ খ্রিঃ.

www.pathagar.com

২. ইংরেজী

AbuSulayman, Abdul Hamid. The Islamic Theory of International Relations : Direction for Islamic Methodology and Thought, Herndon, VA : The International Institute of Islamic thought ১৪০৮ হিঃ / ১৯৮৭ খ্রিঃ.

Arnold, T.W. The Preaching of Islam London : Constable and Company. ১৩৩২ হিঃ / ১৯১২ খ্রিঃ.

Haykal, Muhammad H. The Life of Muhammad,. translatd by Ismail al Faruqi. 8th ed. North American Trust Publication. ১৩৯৬ হিঃ / ১৯৭৬ খ্রিঃ.

al Ghunaimi, Muhammad Talaat. The Muslim Conception of International Law and the Western Approach. Netherlands : Martinus Nijhoff/The Hague, ১৩৯৮ হিঃ / ১৯৭৮ খ্রিঃ.

Ibn Rushd, "Chapter on Jihad," in Bidayah al Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid. Translated by Rudolph Peters in Jihad in Mediaeval and Modern Islam. Belgium : E.J. Brill, ১৩৯৭ হিঃ / ১৯৭৭ খ্রিঃ.

Khadduri, Majid. War and Peace in the Law of Islam. New York : AMS Press, ১৩৯৯ হিঃ / ১৯৭৯ খ্রিঃ.

...The Islamic Law of Nations : Shaybani's Siyar, Baltimore, Maryland : The Johns Hopkins Press ১৩৯৯ হিঃ / ১৯৭৯ খ্রিঃ.

al Nawawi, Yahya Ibn Sharaf al Din. Forty Hadith. Translated by Ezzeddub ১৩৮৬ হিঃ / ১৯৬৬ খ্রিঃ.

Qutb, Syyid, Milestones, Cedar Rapids, lowa : Unity Publishing Co., n.d. ১৩৯৬ হিঃ / ১৯৭৬ খ্রিঃ.

[The Americal Journal of Islamic Social Sciences, Vo. 5, No. 1, September, 1988 পৃ. ২৯-৫৮ হতে সংগৃহীত]

---

www.pathagar.com

জিহাদ, ধর্মযুদ্ধ ও সন্ত্রাসবাদ অপব্যাখ্যার রাজনীতি [১]

*মূল ঃ আসমা বারলাস * ।। অনুবাদ ঃ মেসবাহউদ্দীন আহমাদ*

সার-সংক্ষেপ : আমেরিকার এগারই সেপ্টেম্বরের ঘটনার পর ইসলামে জিহাদের অর্থকে যুগপৎভাবে ধর্মযুদ্ধ এবং সন্ত্রাসবাদ হিসেবে বর্ণনা করা হচ্ছে। এ প্রবন্ধে জিহাদের আসল অর্থকে প্রকাশ করার চেষ্টা করা হয়েছে। কোনো কোনো মুসলমান কিছু বিষয়কে অত্যন্ত চরমভাবে ব্যাখ্যা করছেন। অপরদিকে পাশ্চাত্য দেশগুলো ইসলামকে দীর্ঘদিন ধরে এবং উদ্দেশ্যমূলকভাবে এক ভুল চিত্রে [২] চিত্রিত করছে। এ দু'য়ের চরম অবস্থার ফলাফলই জিহাদের ভুল অর্থ সৃষ্টির অন্যতম কারণ। পাশ্চাত্যের গৃহীত রাজনৈতিক ধারণার ফলে ইসলাম এবং মুসলিম শব্দদ্বয়ের মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে তাও গুলিয়ে ফেলা হয়েছে। মুসলমানদের প্রবণতা, কার্যকলাপ, বর্তমানে গঠিত তাদের মানস এবং ইসলাম সম্পর্কে মতামত প্রদানের সময় যে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক বিষয়াদি রয়েছে সেগুলো বিবেচনায় আনা হচ্ছে না। ফলে যে চরম অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তার পিছনে পাশ্চাত্যের বিবিধ জটিলতাও যে দায়ী তা স্বীকার করা হচ্ছে না। এ প্রবন্ধে মুসলিম এবং অমুসলিম দু'পক্ষের অবস্থানকে আলোচনা ও পর্যালোচনা করা হয়েছে এ জন্য যে, দু'পক্ষই যেন সতর্ক হতে পারে এবং সমগ্র মানবতার কল্যাণে ইসলামের যে বক্তব্য তা দু'পক্ষ শ্রবণ করে এবং আসন্ন বিপদসমূহের ঝুঁকি থেকে নিরাপদ থাকতে পারে।

জিহাদ ও ধর্মযুদ্ধ

মুসলিম এবং অমুসলিম অনেকের দৃষ্টিতে জিহাদ একটি ধর্ম যুদ্ধ। কুরআনে জিহাদের অর্থ প্রচেষ্টা অথবা সর্বাত্মক সংগ্রাম। জিহাদ মোটেই যুদ্ধ সংশ্লিষ্ট বিষয় নয় বরং ধর্মযুদ্ধের চেয়েও অনেক নিম্নতম পর্যায়ের বিষয়। ধর্মের উদ্দেশ্য প্রচার এবং তা বাস্তবায়নের সর্বাত্মক প্রচেষ্টার নাম জিহাদ।[৩] প্রকৃতপক্ষে ধর্মযুদ্ধ করার জন্য খ্রিস্ট ও ইহুদীধর্মে যতটুকু বাধ্যবাধকতা বা নির্দেশ রয়েছে অনুরূপ বাধ্যবাধকতার কথা ইসলামে বলা হয়নি। ফলে, জিহাদকে ধর্মযুদ্ধের সমার্থক করে দেখলে, কুরআনের মধ্যে জিহাদের যে বর্ণনাভঙ্গী তার মূল অর্থ বা চেতনা বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়।

---

* আসমা বারলাস - নিউইয়র্কের ইথাকা কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রফেসর।

www.pathagar.com

ধর্মযুদ্ধকে ইসলামী যুদ্ধ বলার অর্থই হলো ইতিহাসের সত্যকে আড়াল করা। প্রকৃতপক্ষে ধর্মযুদ্ধ ব্যাপারটি পাশ্চাত্যের ইতিহাসের একটি অংশ বা ঐতিহ্য। দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ইউরোপে চার্চ এবং রাষ্ট্রের মধ্যকার সিদ্ধান্তমূলক সংঘাতই ছিল ধর্মযুদ্ধ। অতঃপর সে ধর্মযুদ্ধের মতবাদ পরিবর্তিত হতে থাকে এবং পর্যায়ক্রমে তাকে ন্যায়যুদ্ধের সাথে তুলনা করা হয়। কালক্রমে এ সংঘাতের মধ্য দিয়ে প্রতিবাদী সংস্কার আন্দোলন জন্মলাভ করে। এ প্রতিবাদী সংস্কার আন্দোলন ইউরোপে সে সময়ের ধর্মযুদ্ধের কারণে নিজেদের ভিতর যে ক্লান্তিকর দীর্ঘ রক্তপাত চলছিল অবশেষে তাকে থামাতে সমর্থ হয়। দীর্ঘ রক্তপাতের পর ষোড়শ এবং সপ্তদশ শতাব্দীতে ইউরোপের মানুষ একমত হয় যে, ধর্মের নামে অথবা ধর্মীয় বিষয়াদি আরোপের সব রকমের জবরদস্তিকে অন্যায় মনে করতে হবে এবং এ নিয়ে কোন যুদ্ধের সূচনা হলে তার বিপক্ষে অবস্থান নিতে হবে।[৪] ধর্মের সাথে সে সময়ের চার্চের জুলুম এক হয়ে যাওয়ায়, রাজনীতি থেকে ধর্মের আলাদাকরণের জন্য গড়ে ওঠা মুক্তি বা সংস্কার আন্দোলন হিসেবে বিবেচিত এনলাইটেনমেন্টের পক্ষে ইউরোপীয়রা অবস্থান নেয় এবং সে থেকে তাদের মন-মানসে নিবিড়ভাবে গ্রথিত হয় যে, "ধর্ম নিছকই ধর্মতত্ত্বের পক্ষে বলা কতগুলি বিষয়ের বিশেষায়িত জ্ঞান, যার সাথে আধুনিক রাজনীতির কোন সংস্রব নেই" এবং আরেকটি ধর্ম বিশ্বাসের মতই তাদের চূড়ান্ত ধারণা যে, "আধুনিকতা আর ধর্ম কোনটির সাথে কোনটির মিল নেই"।[৫] অবশ্য এ ধারণার ব্যাপারে অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন যার কারণে ধারণাটি তত্ত্বীয় বা ঐতিহাসিকভাবে সর্বজনগ্রাহ্য হয়নি।

উদাহরণস্বরূপ, মুসলমানদের মধ্যে একটি সাধারণ অভিমত যে, (যা এনলাইটেনমেন্ট মতবাদের মূলকথা) - তাদের ধর্ম ইসলামে কোনরূপ সংকট নেই অর্থাৎ পার্থিব জীবন-যাপন পদ্ধতিতে যে নীতিসমূহ রয়েছে তার সাথে সমন্বয় ঘটাতে তাদের ধর্মের আদেশ নিষেধকে তারা বাধা বলে মনে করে না। তাদেরকে কোন ধর্মযুদ্ধের সাথে ন্যায়যুদ্ধকে তুলনা করার মত ঘটনার মধ্যে পড়তে হয়নি, কারণ কুরআনের আলোকে যে যুদ্ধ সংঘটনের প্রয়োজন হয় তাকে অবশ্যই একটি ন্যায়যুদ্ধ হতে হয়। এর কারণ, লক্ষ্য অর্জনে এবং এর প্রতিটি আচরণের সাথে থাকতে হয় ন্যায়নীতির প্রতিফলন।[৬]

যুদ্ধকে বোঝাতে কুরআনে কোনভাবেই 'জিহাদ' শব্দটি ব্যবহার করা হয়নি। ধর্মের মধ্যে কোন জোর-জবরদস্তি নেই ফলে যুদ্ধের মাধ্যমে ইসলামের বিকাশ ঘটানোর কোন সুযোগই নেই। সুতরাং জিহাদকে একটি "ধর্মযুদ্ধ" হিসেবে বর্ণনা করা দু'ভাবে বিভ্রান্তিকর। এক, জিহাদের পরমতম উদ্দেশ্যকে যুদ্ধের মধ্যে নামিয়ে আনা আর অন্যটি হলো জিহাদের সাথে যেহেতু ধর্মের বিষয় জড়িত সেহেতু একে অন্যায় হিসেবে চিত্রিত করা। মুসলমানদের মধ্যে বর্তমানে কুরআনের চর্চা কমে গিয়েছে বিধায় এর ওপর নিবিড় গবেষণা প্রয়োজন। আমাদের আলোচনা শুরুর আগে ঐতিহ্যবাদী এবং আধুনিক ব্যাখ্যা অনুযায়ী জিহাদের তত্ত্বগত স্বরূপ সঠিকভাবে পেশ করা দরকার।

www.pathagar.com

কুরআন ও জিহাদ

কুরআনে 'জিহাদ' (এবং তৎ সম্পর্কিত) শব্দ ৩৬ বার এসেছে এবং প্রতিবারেই বর্ণিত হয়েছে ন্যায়নীতির সংগ্রামের কথা। ক্বালব, জিহ্বা, কলম, নৈতিকতা, ঈমান ইত্যাদির সাথে জিহাদ শব্দটি গভীরভাবে যুক্ত। ইসলামে যে জিহাদের সাথে জিহ্বা, মন এবং হাত সংযুক্ত সে জিহাদই বড় জিহাদ আর ছোট জিহাদ হলো যার সাথে অস্ত্রশস্ত্রের ব্যাপার জড়িত। কুরআনে এ রকমের জিহাদকে 'ক্বিতাল' (যুদ্ধ) শব্দ দিয়ে বুঝানো হয়েছে। ক্বিতাল শব্দের সাথে জিহাদ শব্দের কিছুটা পার্থক্য আছে। ক্বিতাল যুদ্ধকর্মের সাথেই সংযুক্ত। ইসলামী চিন্তাধারায় এ নিয়ে দু'টি ধারণা [৭] বিদ্যমান। জিহাদ যা যুদ্ধের বিষয় হিসেবে পরিগণিত তা কুরআন নাযিলের পরবর্তী [৮] একটি কালের ধারণা এবং এ বিষয়টিকে বুঝতে হলে নির্দিষ্ট রাজনৈতিক এবং ঐতিহাসিক সময়ের ক্রান্তিতে মুসলমানদের সে সময়ের ব্যাখ্যাসমূহকে বিবেচনায় আনতে হবে।

কুরআনে, "স্পষ্ট লক্ষ্যের ভিত্তিতে সশস্ত্র যুদ্ধে জড়িত হওয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছে এবং যত দ্রুত সম্ভব লক্ষ্য পূরণের দ্বারা তা আবার সীমিতও করা হয়েছে...। কোন আগ্রাসন এবং সঙ্গত কারণ ছাড়া যুদ্ধ আরম্ভ করা নিষিদ্ধ"। [৯] আত্মরক্ষার অধিকার লাভ করা, নিজ জাতিকে রক্ষা করা অথবা নির্যাতনের হাত থেকে কোন ঈমানদারকে [১০] রক্ষা করার জন্য কুরআনের বেশ কয়েকটি আয়াতে যুদ্ধের পক্ষে সমর্থন পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ "যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হলো তাদের যারা আক্রান্ত হয়েছে ... তাদেরকে যাদের ঘরবাড়ী হতে অন্যায়ভাবে বহিষ্কার করা হয়েছে শুধু এ কারণে যে, তারা বলে, 'আমাদের রব আল্লাহ' আর এটাতেও সমভাবে মুসলিম, খ্রিস্টান এবং ইহুদীদের অধিকার রয়েছে যে, তাদের বিরুদ্ধে কৃত নির্যাতনের প্রতিরোধ করার। একই আয়াতে বলা হয়েছে : "আল্লাহ যদি মানবজাতির একদলকে অন্যদল দ্বারা প্রতিহত না করতেন তাহলে বিধ্বস্ত হয়ে যেত সংসার বিরাগীদের মঠ, গির্জা, সিনাগগ এবং মসজিদসমূহ - যেখানে অধিক স্মরণ করা হয় আল্লাহর নাম" (২২ : ৩৯ -৪০)। [১১]

মুসলিমদের নির্যাতিত মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের পক্ষে যুদ্ধ করার আহ্বান জানিয়ে বলা হয়েছে : "অসহায় নর-নারী এবং শিশুগণ যারা আর্তচিৎকার করে বলে : হে আমাদের রব! এ জনপদ যার অধিবাসী যালিম, উহা হতে আমাদের অন্যত্র নিয়ে যাও; তোমার নিকট হতে কাউকে আমাদের অভিভাবক কর এবং তোমার নিকট হতে কাউকে আমাদের সহায় কর !" (৪ : ৭৫) [১২] যদিও এ আয়াতে বর্ণিত নির্যাতন এবং মুক্ত করা শব্দদ্বয়ে যথেষ্ট ব্যাখ্যার অবকাশ রয়েছে। তবে এর মধ্যে আগ্রাসন চালানোর জন্য কোনরূপ আহ্বানের ইংগিত নেই। যারা কুরআনে আগ্রাসন চালানোর ইংগিত রয়েছে মর্মে উল্লেখ করেন তারা সেসব আয়াতের উদ্ধৃতি দেন যেমন "আল্লাহর পথে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর ... (এবং) যেখানে তাদের দেখা পাবে তাদের সেখানে হত্যা করবে এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাও যতক্ষণ না ... সকল এবাদত একমাত্র আল্লাহর জন্যই নিবেদিত হয়" বা এরকমেরই অন্য আয়াত। তবে এভাবে প্রেক্ষিত পরম্পরা বাদ

www.pathagar.com

দিয়ে কোন আয়াতের আংশিক মর্মকে বিবেচনা করা সঠিক ব্যাখ্যার আওতায় আসে না। অবশ্যই সামগ্রিকতাকে নিয়েই কুরআন পাঠ করতে হবে। যে আয়াতগুলি উপরে উল্লেখিত হয়েছে সেগুলি প্রেক্ষিত পরম্পরাসহ পাঠ করা হলে দেখা যাবে আয়াতগুলির অর্থ এবং তাৎপর্য আমাদেরকে এক নতুন সিদ্ধান্তে এবং উপলব্ধির নিকটে নিয়ে গেছে। "যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তোমরাও আল্লাহর পথে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর ; কিন্তু সীমালঙ্ঘন করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীগণকে ভালবাসেন না। যেখানে তাদেরকে পাবে হত্যা করবে এবং যে স্থান হতে তারা তোমাদেরকে বহিষ্কৃত করেছে তোমরাও সেই স্থান হতে তাদেরকে বহিষ্কার করবে। ফিতনা হত্যা অপেক্ষা গুরুতর। মসজিদুল হারামের নিকট তোমরা তাদের সাথে প্রথমেই যুদ্ধ করবে না যে পর্যন্ত না তারা সেখানে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে। যদি তারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তবে তোমরা তাদেরকে হত্যা করবে। এটাই কাফিরদের পরিণাম। যদি তারা বিরত হয় তবে নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। আর তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকবে যাবত ফিতনা দূরীভূত না হয় এবং সকল এবাদত কেবল আল্লাহর উদ্দেশ্যে নিবেদিত হয়। (২ : ১৯০-৯৩) [১৩]

আলোচ্য আয়াতগুলোকে বিশদ ব্যাখ্যার দিকে না দিয়ে বরং একটি সাধারণ বিষয়ের ওপরই আমার আলোচনাকে কেন্দ্রীভূত করবো। প্রথমে নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও কুরআনের পরবর্তী আয়াতে আগ্রাসনের উপর সর্বপ্রথমে সুনির্দিষ্টভাবে নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়েছে। প্রথম আয়াতের নিষেধাজ্ঞাকে সামনে রেখেই পরের আয়াতগুলিকে বুঝে নিতে হবে। সেসব আয়াতে বলা হয়েছে যে, মুসলিমরা তখনই যুদ্ধ শুরু করবে যখনই তাদের ওপর যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়া হবে আর সে যুদ্ধ তখনই শেষ করা হবে যে মুহূর্তে তারা যুদ্ধ থেকে বিরত হবে। [১৪] এ আয়াতের বাকী অংশকে কেউ এভাবে অর্থ করতে পারে : 'যতক্ষণ না সকল এবাদত কেবল আল্লাহর উদ্দেশ্যে নিবেদিত হয়' অর্থাৎ হত্যা না করা অথবা সকল শত্রু ইসলামের মধ্যে শামিল না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে। এরূপ অর্থ করা দু' কারণে নিষিদ্ধ। প্রথমত : কুরআনে দ্বীনের ব্যাপারে জোরজবরদস্তি নিষেধ করা হয়েছে। আল্লাহ নবী (সা) কে মনে করিয়ে দিয়েছেন যে, তাঁর কর্তব্য মানুষদের ইসলামের দিকে ডাকা (২ : ২৫৬)। মোটেই তাদের বাধ্য করা নয়। কুরআনের শিক্ষা এই যে, বিভিন্ন ধর্ম ও সম্প্রদায়ের যে বিভক্তি রয়েছে তাতেও আল্লাহর ইচ্ছা রয়েছে (নিবন্ধের পরের দিকে এ ব্যাপারে আলোচনা করা হবে)। দ্বিতীয়ত: মূল পাঠ [১৫] এবং ঐতিহাসিক যুক্তি [১৬] অনুযায়ী সে আয়াতকে 'মুসলমানদের নিজেদের নির্বিঘ্নে এবাদত করার অধিকার আদায় হওয়া পর্যন্ত' মর্মে অধ্যয়ন করা যেতে পারে।

যুদ্ধাবস্থায়ও কোনরূপ জুলুম করার বিরুদ্ধে কুরআন সতর্ক করে দিয়েছে। এই আয়াতের ওপর ভিত্তি করে মধ্যযুগের মুসলমানরা যুদ্ধে শরীয়তের বিধান স্থির করেছেন : "আল্লাহর উদ্দেশ্যে ন্যায় সাক্ষ্যদানে তোমরা অবিচল থাকবে ; কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদেরকে যেন কখনও সুবিচার বর্জনে প্ররোচিত না করে," (৫:৮) [১৭]

www.pathagar.com

নির্দিষ্ট কয়েকটি আয়াত পাঠের মধ্য দিয়ে যুদ্ধ সংক্রান্ত কুরআনের দৃষ্টিভঙ্গী এবং মর্ম উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। আলোচ্য প্রবন্ধের উদ্দেশ্য হলো, যে কেউ যেন একটি আয়াত পড়ে বা তার অংশ বাছাই করে আগ্রাসন চালানোর বা আগ্রাসনের অস্তিত্ব খোঁজার চেষ্টা না করেন। আয়াতের সামগ্রিক ধারাবাহিকতাকে বাদ না দেয়া এবং আয়াত নাজিলের ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতকে বিবেচনা করার প্রতি দৃষ্টি রাখা উচিৎ। আর ঐ রকমের খণ্ডিত, প্রেক্ষিত পারম্পর্যহীন এবং ইতিহাস বিচ্ছিন্ন পড়াশুনার মাধ্যমে দুর্ভাগ্যজনকভাবে ইসলামের বিভিন্ন বিষয়কে বিবেচনা করার বা উপসংহার টানার রীতি নির্দিষ্ট করার ফলে কুরআনের সঠিক শিক্ষা এবং মর্ম আমাদের নিকট সঠিকভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে না। [১৮]

জিহাদ ক্লাসিক্যাল অর্থাৎ ঐতিহ্যবাদীদের ধারণা

ইসলামের মধ্যযুগের ইসলামী আইনের ব্যাখ্যাকারীগণ জিহাদের সাথে যুদ্ধ নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত মর্মে যে মত পোষণ করতেন বা তার পিছনে কুরআন এবং হাদিসের যে সমর্থন রয়েছে তাকেও সঠিকভাবে ধারণ করতে হলে ইসলামের দর্শন এবং সে সময়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের [১৯] আলোকেই তাকে বুঝতে হবে। মার্কিন সমাজ বিজ্ঞানী আর্মস স্ট্রংয়ের মতে, ইসলামের এই দর্শন পূর্ণ বিকাশ লাভ করে ঠিক তখনই যখন মুসলিম ইতিহাসের স্বর্ণযুগ (এ সময়টা ইউরোপের মধ্যযুগ)। আর এ সময় মুসলিমরা বিরাট সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। ফলে সে সময়ের মুসলিম আইনবিশারদগণ খুব স্বাভাবিকভাবেই তাদের বিজয়ের সমর্থনে ধর্মীয় ব্যাখ্যাকে [২০] নিজের পক্ষে করে নিয়েছেন। তাদের মতে পৃথিবী দু'ভাগে বিভক্ত : একটি 'দারুল ইসলাম' (শান্তির দুনিয়া) অন্যটি 'দারুল হারব্' (অশান্তির দুনিয়া)। আর এর মাঝে ছিল বোঝা-পড়ার বা সন্ধিভুক্ত দুনিয়া'। [২১] এই বিভক্তি প্রকৃতপক্ষে কুরআন হাদিসের কোথায়ও নেই বরং এটি ছিল সে সময়ের একটি বাস্তবতা। তাছাড়া, এ বিভক্তির যৌক্তিকতার পিছনে ছিল আইনগত কারণ। [২২] কোনভাবেই তা ধর্মতত্ত্বের সাথে যুক্ত ছিল না। প্রধানত এই দু' বিভক্তির মধ্যে মূল বৈশিষ্ট্য ছিল এদের অন্তঃস্থিত সমাজের সাংগঠনিক কাঠামো, প্রতিষ্ঠান এবং পালনীয় নীতিসমূহ। [২৩] কোনভাবেই এগুলো ঐসব জনপদে পালিত কোন নির্দিষ্ট ধর্ম বা আচরণবিধি ছিল না।

দারুল ইসলামকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যেখানে শান্তি, ন্যায়বিচার, আইন-শৃঙ্খলা এবং সম্প্রীতি বিদ্যমান সে হিসেবে। সেখানে ইসলামী আইনে মুসলিম এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জীবন এবং সম্পত্তির নিরাপত্তা নিশ্চিত। মুসলিম এবং অমুসলিম নির্বিশেষে স্ব স্ব ধর্ম পালনে ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগতভাবে স্বাধীন। আর যে মুসলিম রাষ্ট্রে এ শর্তসমূহের অস্তিত্ব নেই সে রাষ্ট্র মোটেও দারুল ইসলাম হতে পারে না। [২৪] আর অন্যদিকে দারুল হারব্কে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে সহিংসতা, অজ্ঞতা এবং জুলুমবাজীর রাজত্ব হিসেবে। যাকে এক কথায় বলা যায় 'অন্যায়ের দুনিয়া'। এই সংজ্ঞায় সকল অমুসলিম রাষ্ট্রকে দারুল হারব্ বলে বিবেচনা করা হয়নি। যে সব অমুসলিম রাষ্ট্র ইসলামকে আনুষ্ঠানিকভাবে গণ্য করে, মুসলিম সম্প্রদায়ের ওপর বিরূপ নহে এবং নাগরিকের যে

www.pathagar.com

কোন ধর্ম গ্রহণের বা ধর্ম পালনের স্বাধীনতা নিশ্চিত তেমন রাষ্ট্রকে দারুল হারব্ হিসেবে গণ্য করা হয়নি বরং এসব রাষ্ট্র সমঝোতামূলক বা সন্ধিভুক্ত দুনিয়া হিসেবে বিবেচিত। [২৫] ঐতিহ্যবাদী আইনবিদগণের মতে দারুল হারব্ (ধর্মীয় এবং আইনগত দৃষ্টিতে আলাদা) চিহ্নিত করার অর্থ এ নয় যে, ঐসব এলাকায় যুদ্ধ পরিচালনার জন্য পূর্ব থেকেই লক্ষ্য স্থির করা আছে। বরং এর অর্থ দারুল হারব্‌কে মুসলিমদের স্বীকৃতি প্রদানের মাধ্যমে অমুসলিম দুনিয়ার সাথে সহ-অবস্থান করার [২৬] একটি আইনগত সোপান রচনা করা। কারণ, ঠিক ঐ সময়ে মুসলমানদের রাষ্ট্রের বিস্তৃতি সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল। ঐতিহ্যবাদী আইনবিদগণ আক্রমণাত্মক ও আত্মরক্ষামূলক জিহাদকে, 'ধর্মীয় বাধ্যবাধকতার বিপরীতে যথার্থ কিনা' [২৭] মর্মে ভাগ করেছেন। আক্রমণাত্মক জিহাদের সময় যদিও একটি জাতীয় কর্তব্য স্থির হয়ে যায় তবে এ জিহাদের আহ্বান কেবলই একজন ইমাম (মুসলিম সম্প্রদায়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতা) দিতে পারেন। তদুপরি আক্রমণাত্মক জিহাদকে নিয়ে যথেষ্ট বিতর্ক রয়েছে কারণ এ ধরনের জিহাদ করার সমর্থনে কুরআনের আদেশ এবং নবী (সা)-র সুন্নাহ [২৮] থেকে স্পষ্টভাবে কোন দলিল পাওয়া যায় না। অন্যদিকে আত্মরক্ষামূলক জিহাদ করা প্রত্যেকের একটি অধিকার এবং স্ব স্ব দায়িত্ব পালনের অংশ হিসেবে বিবেচিত। কিন্তু এ দু' জিহাদের কোনটাই ইসলাম কায়েম করার জন্য নহে। সমাজ বিজ্ঞানী ক্যারেন আর্মস্ট্রিং উল্লেখ করেছেন, 'আরবরা যখন আরবের বাইরে অভিযান পরিচালনা করেছেন তারা তা কোনরূপ ধর্মীয় আহ্বানের ভিত্তিতে করেননি'। এ সত্ত্বেও পাশ্চাত্যের একটি বদ্ধমূল ধারণা, 'ইসলাম একটি সহিংস এবং যুদ্ধপ্রিয় ধর্ম। এরা তাদের মানুষকে পর্যন্ত তরবারি দিয়ে হত্যা করে, ইসলামের বিস্তারের সাথে যেসব যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল সেগুলির কারণ যথার্থভাবে পাশ্চাত্য উপলব্ধি করতে পারেনি বিধায় এসব যুদ্ধের ব্যাপারে তারা ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে আছে বলে ক্যারেন আর্মস্ট্রিং মনে করেন। এসব যুদ্ধাভিযানের পিছনে ধর্মের কোন সংশ্লিষ্টতা ছিল না এবং ওমর (রাঃ) (যে খলিফার সময়ে যুদ্ধ ঘটেছিল) নিজেও বিশ্বাস করতেন না যে, সমগ্র দুনিয়া জয় করে নেয়ার জন্য তার ওপর আল্লাহর আদেশ ছিল।" [২৯]

মুসলিমদের জয়ী হওয়া যুদ্ধগুলি ছিল 'এক এলাকা বা এক রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অন্য এলাকা বা অন্য রাষ্ট্রের যুদ্ধ, মোটেই এক ধর্মের বিরুদ্ধে অন্য ধর্মের কোন যুদ্ধ নয়"। [৩০] তবে এর অর্থ এই নয় যে, মুসলমানরা তাদের গত এক হাজার বছরের ইতিহাসে নিজ ধর্ম বিস্তৃতির লক্ষ্যে অথবা দুনিয়াতে তাদের আধিপত্য রক্ষার জন্য শক্তি প্রয়োগের কোনো চেষ্টা করেনি। খারেজীদের (যারা বর্তমান সময়ের চরমপন্থীদের মত) মধ্যে একদল এমন পথ বেছে নিয়েছিল। তবে তারা ইসলামের শুরুর দিকেই অর্থাৎ যখন থেকে মুসলিম রাষ্ট্র ধীরে ধীরে সম্প্রসারিত হয় এবং বিরাট সামরিক শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হতে থাকে, তখন তারাও এসব কাজ থেকে সরে যেতে বাধ্য হয়। ইসলাম তার সূচনা থেকেই অতিউৎসাহী উগ্রপন্থার বিরোধিতা করেছে। [৩১] মধ্যযুগের মুসলিমদের মধ্যে উগ্রপন্থা পরিহারের বিষয়টি আরো স্পষ্ট। ধর্মের ব্যাপারে শক্তি প্রয়োগ বা ধর্মান্তরের জন্য রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ বিষয়েও সতর্কতা লক্ষণীয়। এ সময়ে রাষ্ট্র শাসনের অন্যতম

www.pathagar.com

নীতিই ছিল মানুষের দুর্বলতা এবং ভিন্নমত মেনে নিয়ে ক্ষমা প্রদর্শন করা। ভারসাম্য নীতিগ্রহণ বা মধ্যপন্থা অবলম্বন। এসব তাত্ত্বিক আলোচনা মুসলিম মনীষী আল গাজ্জালীর রচনাবলীতে স্পষ্টভাবে বর্ণিত আছে। [৩২]

জিহাদ সম্পর্কিত ঐতিহ্যবাদীদের ধারণার সাথে কুরআনের যথেষ্ট পার্থক্য থাকলেও তারাও এসব জিহাদকে কখনও ধর্মযুদ্ধ হিসেবে সমর্থন করেনি। অধিকন্তু জিহাদ সম্পর্কে তখন শক্ত নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছিল। যেমন যুদ্ধ ঘোষণার ব্যাপারে হঠাৎ আক্রমণকে নবী (সা) নিষেধ করেছেন বিধায় এ ধরনের যুদ্ধ ঘোষণাকে বিশ্বাসঘাতকতা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে; তাছাড়া শিশু, মহিলা, অসামরিক মানুষকে হত্যা করা নিষিদ্ধ ছিল। জিম্মি করা এবং বেসামরিক লোকজনের জীবনযাপনকে বিপদাপন্ন করা, শত্রুকে ধ্বংসের নিমিত্তে আগুন জ্বেলে দেয়া বা প্লাবন সৃষ্টি করা, ফলজ বাগানের গাছ কাটা, উপাসনালয় ধ্বংস করা, ইচ্ছাকৃত মানুষের অঙ্গ কর্তন করা, পানীয় জলে বা পানির কূপে বিষ মেশানো [৩৩] ইত্যাদি নিষিদ্ধ। এগুলো বিবেচনায় আনলে যে কারো পক্ষে আলোচ্য জিহাদকে অন্যসব যুদ্ধবিগ্রহ আলাদা করা একেবারেই সহজ হয়ে যায়।

জিহাদ সম্পর্কে নব্য ধারণা

জিহাদের আগের অর্থ এবং নতুন অর্থের পার্থক্যকরণ এক কঠিন ব্যাপারই বটে। সে সময়কার আইনবিদগণ তখনকার রাজনৈতিক এবং সামাজিক প্রেক্ষিতকে সামনে রেখেই যুদ্ধের নীতিমালা প্রণয়ন করেছিলেন। বর্তমানে ঠিক তেমন ভূ-রাজনৈতিক অবস্থা বিরাজ করছে না। পৃথিবীর প্রথম আধুনিক সাম্রাজ্য হিসেবে আখ্যা পেতে পারে যে মুসলিম সাম্রাজ্য বা খিলাফত তা প্রায় এক হাজার বছরের মত টিকে থাকার পর একশত বছরের কাছাকাছি হয় সেটিরও বিলুপ্তি ঘটেছে। তবুও এর প্রভাব এবং স্মৃতিসমূহ এখনও অনেক সামাজিক কর্মকাণ্ডে বেঁচে আছে। সে সাম্রাজ্যের বা খিলাফতের শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তে মুসলিম ভূখণ্ড এখন টুকরো টুকরো হয়ে নিজেরাই স্ব স্ব দেশের শাসন কার্য চালাচ্ছে। তবে এসব শাসক দুর্নীতিতে নিমজ্জিত, অত্যাচারী এবং অনৈসলামী মনোভাবাপন্ন। এদের প্রায় সকলেই আমেরিকা অথবা পাশ্চাত্যের আনুগত্য প্রদর্শনের মাধ্যমে ক্ষমতায় টিকে আছে। পশ্চিমা উপনিবেশবাদের অধীন থাকার ফলে এ দেশগুলির মুসলিম সমাজের মধ্যে কিছু আধুনিকতার অভিজ্ঞতা অর্জন লক্ষ্য করা গেলেও তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন বা রাজনৈতিক মুক্তি আসেনি। কেবল নিপীড়নমূলক ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদের [৩৪] আজ্ঞা পালনের মধ্যেই এদের শাসন-পীড়ন পরিচালিত হচ্ছে।

জিহাদ অর্থের সাথে বর্তমান দুনিয়া শাসনকারী আমেরিকা এবং পাশ্চাত্যের অন্যান্য দেশ এবং তাদের অনুগত মুসলিম দেশসমূহের অবস্থা নিয়ে সাইয়্যেদ কুতুব, আবুল আ'লা মওদুদী এবং আয়াতুল্লাহ খোমেনীর মূল্যবান বক্তব্য রয়েছে। আলোচ্য প্রবন্ধে আমি সেসব দিক এবং মুসলমানরা কেনই বা এসব গ্রহণ করছে [৩৫] তা পরীক্ষা করতে চাইনি। বরং আমার আলোচনার মধ্যে তার ওপরই বেশী গুরুত্ব দিয়েছি যা জিহাদের সকল তত্ত্বীয় আলোচনায় বারবার এসেছে। দারুল ইসলাম এবং দারুল হারব্ বিষয় দু'টিকে

www.pathagar.com

আমি ভিন্নভাবে বর্ণনা করতে চেয়েছি। ঐ দু'টির বর্তমান রূপ হলো একদিকে আল্লাহর দল অন্যদিকে শয়তানের দল। এ আলোচনার প্রেক্ষিতে যে আইন তা হলো শরীয়াহ আর বাকী সব মানুষের মনগড়া খেয়াল খুশীর আইন। একটি মাত্রই সত্য পথ তা হলো ইসলাম আর বাকী সকল পথই বিভ্রান্তি বা জাহিলিয়াত।[৩৬] এই পরিবর্তনের ফলে বিশ্বাসীরা স্বাভাবিকভাবেই উৎসাহী হয় ভিন্ন নীতির বা ভিন্ন ধর্মের বিরুদ্ধে। চরমপন্থার দিকে যাওয়ার প্রতিক্রিয়া হলো, আধুনিক মুসলিমদের জিহাদ সম্পর্কে সংশয়াপন্ন ধারণার সৃষ্টি। এ রকম অবস্থার সাথে মধ্যযুগের ইহুদী ও খ্রিস্টানদের আশংকা বা চিন্তাধারার[৩৭] সাথে মুসলিমদেরও একটি মিল লক্ষ্য করা যায়। এ চরম ধারণার সাথে কুরআনের শিক্ষার সংঘাত পরিলক্ষিত হয়। আল্লাহ্ বলেন, "তোমাদের প্রত্যেকের জন্য শরীয়ত ও সুস্পষ্ট পথ নির্ধারণ করেছি। ইচ্ছা করলে আল্লাহ্ তোমাদেরকে এক জাতি করতে পারতেন, কিন্তু তিনি তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তা দ্বারা তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে চান। সুতরাং সৎকর্মে তোমরা প্রতিযোগিতা কর"। (৫:৪৮)[৩৮]

অন্যভাবে বলা যায়, এরূপ ধর্মগত বা আইনগত ভিন্নতা বা বৈচিত্র্য তা কিন্তু আল্লাহর পরিকল্পনারই অংশ। এর মধ্যে খেয়ালের কোন অবকাশ নেই। ফলে আল্লাহর সৃষ্ট নানা জাতিকে এক জাতি করা বা প্রতিপক্ষ জাতিকে উৎখাত করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। কুরআনে মানুষের এই বিভিন্নতা বারবার বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ্ বলেন, "তোমাদের বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি, গোত্রে, যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পার। (এ জন্য নয় যে, তোমরা একে অন্যকে ঘৃণা কর)। তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নিকট সেই ব্যক্তিই অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে তোমাদের মধ্যে অধিক মুত্তাকী" (৪৯ : ১৩)।[৩৯] পণ্ডিতগণ এ বিষয়টিকে এভাবে দেখেন অর্থাৎ একে অপরের সাথে পরিচিত হওয়ার অর্থ হলো : 'এটি স্পষ্টতই বিভিন্ন জাতির মধ্যে পারস্পরিক সংলাপের একটি প্রক্রিয়া"।[৪০] জিহাদের নতুন অর্থে এ বিষয়টিকে আলাদা করে দেখানো হয়েছে। সংলাপ এবং জাতিগত পার্থক্য বা বহু জাতিত্বের বিষয়টি অস্বীকার করা হয়েছে। ফলে কোনরূপ আপোস-সন্ধি বা সহাবস্থান করার মতবাদগত দিককে সমর্থন করার সুযোগ আর থাকে না। এ নব্য মতবাদ সম্পূর্ণই ঐতিহ্যবাদী মতবাদের বিপরীত।

পদ্ধতিগতভাবে, এ ধরনের বহু বিরোধী মতবাদ এবং একান্তবাদী মতবাদের[৪১] ভিত্তি হলো কুরআনের নসখ্ সম্পর্কিত আয়াত। এই মতবাদে বিশ্বাসীগণ মনে করেন যে, "মুসলিমদেরকে কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার[৪২] আহ্বানের আয়াতগুলির মাধ্যমে বহুজাতিভিত্তিক ধারণার অস্তিত্ব বুঝা যায় বা অমুসলিমদের সাথে বোঝাপড়ার ভিত্তিতে অবস্থান করার যে আয়াত্ রয়েছে তা বাতিল্ হয়েছে"। অথচ এসব কাফিরদের অনেকেই ইহুদী এবং খ্রিস্টান। কুরআনে তাদের পরিচয় পাওয়া যায় 'আহ্লে কিতাব' হিসেবে।

চিন্তার ক্ষেত্রে সমকালীন অসহিষ্ণুতার দিকে তাকালে বুঝা যায় যে, মানুষ যতটুকু অসহিষ্ণু তেমন অসহিষ্ণুতার বিষয় কুরআনের কোথাও বলা হয়নি। সুতরাং প্রশ্ন হলো এ ধরনের কথা বা ব্যাখ্যা কিভাবে আসলো, কিভাবে তা বাস্তবতার রূপ নিচ্ছে এবং এসব

www.pathagar.com

বক্তব্যগুলির নির্দিষ্ট প্রেক্ষিত কী ? এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে ব্যর্থ হলে, মুসলমান এবং মুসলমানদের যারা সমালোচক উভয় পক্ষই ইসলামকে ভুল ব্যাখ্যা করবে এবং শেষ পর্যায়ে জিহাদের শিক্ষা কালিমালিপ্ত হবে। (নারী-পুরুষের সমতার বিষয়টিও এখানে সমান গুরুত্বপূর্ণ) [৪৩] তবে ইসলামের সমালোচকরা সমালোচনার সময় কেবল তাদের মনে লালিত বিদ্বেষ, ভিন্ন ধর্মের এবং বিশেষ শব্দবোধের ভিত্তিতে আলোচনায় অগ্রসর হয়ে থাকে। আমি এখন এর উপরই আলোচনা করবো।

জিহাদ, যুদ্ধ এবং সন্ত্রাসবাদ

কুরআনে বর্ণিত জিহাদ এবং ক্ল্যাসিকাল মতবাদের জিহাদকে সন্ত্রাসবাদ থেকে সহজে পার্থক্য করা যায় বটে তবে জিহাদের প্রণীত নতুন সংজ্ঞা ঠিক সেরকম কোন নির্ধারিত বিধিকে অনুসরণ করে না। ফলে, সন্ত্রাসবাদ এবং নব্য জিহাদের মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্যকরণ দুরূহ হয়ে পড়েছে। ফলে নব্য জিহাদের কৌশল এবং সন্ত্রাসবাদের সংজ্ঞা প্রায়ই এক স্থানে মিশে যাচ্ছে।

আমেরিকার আইনে সন্ত্রাসবাদের সংজ্ঞা হলো : "পূর্ব পরিকল্পিত, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত সহিংসতা যার লক্ষ্য অসামরিক স্থাপনা ও ব্যক্তির ধ্বংস সাধন। এ নাশকতার পিছনে থাকে কোন জাতির ক্ষুদ্রগোষ্ঠী অথবা গুপ্ত এজেন্ট যাদের উদ্দেশ্যের মধ্যে অন্যতম হলো মানুষের দৃষ্টিকে তাদের ওপর নেয়ার চেষ্টা করা"। [৪৪] এই সংজ্ঞাকে সহজে যুদ্ধের সংজ্ঞার সাথেও মিলানো যায়। কেনোনা যুদ্ধও পূর্ব পরিকল্পিত এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত সহিংসতা। এরও লক্ষ্যস্থল বেসামরিক স্থাপনা (অনেকটা সুনিয়ন্ত্রিত নীতি) ধ্বংস করা এবং এতেও জনগোষ্ঠীকে পরাস্ত বা প্রভাবিত করার উদ্দেশ্য থাকে। সন্ত্রাসবাদের পিছনে কোন ক্ষুদ্র গোষ্ঠী যেমন থাকে তেমনি অনেক সময় রাষ্ট্রেরও মদদ থাকে। কিন্তু কোন রাষ্ট্রকে যদি সন্ত্রাসী হিসেবে চিহ্নিত করি তখন সন্ত্রাসী এবং তাদের শিকারে পরিণত হওয়া মানুষদের মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে তাকে ভুলে যাই এবং সে দেশের কতিপয় মানুষের সন্ত্রাসের কারণে এক পর্যায়ে দেশের পুরো জনগোষ্ঠীকে আমরা একই অভিধায় অভিহিত করে ফেলি। প্রকৃতপক্ষে এ জনগোষ্ঠী দু'বার অত্যাচারের শিকার হয়। প্রথমবার সন্ত্রাসীদের দ্বারা আর দ্বিতীয়বার হলো যারা সন্ত্রাসীদের খোঁজ করে তাদের দ্বারা। উভয়পক্ষের অভিযানেই বেসামরিক লোকজন বেঘোরে মারা পড়ে। এছাড়া, যেকোন দল বা রাষ্ট্রকে আমরা যে সন্ত্রাসী বলে আখ্যা দিচ্ছি তাতে যে জ্বলন্ত বিষয়টি আমাদের তাড়া করছে তার কিন্তু কোন সুরাহা হচ্ছে না। আমরা একই প্রকার কাজের একটিকে 'সন্ত্রাসবাদ' আর অন্যটিকে 'মুক্তি সংগ্রাম' বলছি। অর্থাৎ একজনের কাছে কেউ মুক্তি সংগ্রামী আবার অন্যের কাছে সন্ত্রাসী। এই অবস্থায় সঠিক পরিচয় নিরূপণের ভিত্তি কী হবে ?

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ইহুদীদের ইসরাইল রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠার প্রয়াসকে দুনিয়াব্যাপী একটি জাতীয়তাবাদী আন্দোলন হিসেবে গ্রহণ করা হচ্ছে। অথচ প্যালেস্টাইনে ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবিটি একটি ধর্মীয় দাবি, খোদার সাথে তাদের কথিত চুক্তির ভিত্তিতে তারা

www.pathagar.com

তা দাবি করছে। এ দাবি মোটেই রাজনৈতিক দাবি হতে পারে না। অন্যদিকে প্যালেস্টাইনীদের রাষ্ট্র সংগ্রামকে একটি ধর্মযুদ্ধ হিসেবে চিহ্নিত করা হচ্ছে। তাদের সংগ্রামকে উপনিবেশ বিরোধী বলা হচ্ছে কিন্তু জাতীয়তাবাদী মুক্তি সংগ্রাম হিসেবে দেখা হচ্ছে না। তাদের ভূমি দাবির আন্দোলন পুরোটাই রাজনৈতিক। কোনভাবেই ধর্মীয় অধিকার বা ধর্মীয় স্বাধীনতার পক্ষে উথাপিত ইহুদীদের যুক্তির বিপরীতে নয়। এছাড়া অনেকেরই অভিমত, সন্ত্রাসবাদ ইহুদীদের সৃষ্ট এবং তাদের অন্তঃস্থিত কৌশল। তারা উল্লেখ করে থাকেন, ৬০ বছর আগে ইহুদী ইরগান, স্টার্ন গ্যাং, হাজানাদের দ্বারা আরবদের ভীত সন্ত্রস্ত করার জন্য আরবদের এলাকায় এবং আরবীয়দের জনবসতির ওপর বোমা ফেলা হয়।[৪৫] স্টার্ন ইহুদীদের ব্যাংকের ওপর হামলা চালিয়ে এবং নিজের লোকের জানমালের ক্ষয়ক্ষতি করে[৪৬] এবং এই অজুহাতে পরিকল্পিতভাবে ইরগান দারইয়াসিন বস্তির প্রায় ২৫০ জন বেসামরিক নারী-পুরুষকে এবং শিশুদের হত্যা করে।[৪৭] দখলদার ব্রিটিশরা ক্ষমতায় থাকাকালীন এ সকল দলগুলি সংগঠিত সন্ত্রাসবাদী দল হিসেবে প্রকাশিত হয়। বেশীরভাগ ইহুদী কিন্তু দেশপ্রেমিক। তাদের দেশপ্রেমের সুযোগ নিয়ে মেনহ্যাম বেগিনের মত লোকদের জন্ম, এই বেগিনই স্টার্ন গ্যাংয়ের নেতা। বেগিন এক সময় প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত নির্বাচিত হন। আবার এই ইহুদীদের যারা আমেরিকান তারা প্যালেস্টাইনীদের নিন্দা করে এ কারনে যে, তারা সন্ত্রাসী কাজে জড়িত। অথচ প্যালেস্টাইনীরা দখলদার ইসরাইলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। এমনকি এ পথে তারা তাদের নিজেদের প্রাণ পর্যন্ত উৎসর্গ করছে।

প্রাণ উৎসর্গ করার এ ধরনকে অনেক মানুষ 'ইসলামী সন্ত্রাসবাদের' রূপ হিসেবে চিহ্নিত করে এবং যেসব তরুণ-তরুণী নিজের প্রাণ উৎসর্গ করে তাদেরকে নৃশংস মানুষ হিসেবে চিহ্নিত করে তাদের বিরুদ্ধে প্রচার করা হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে জাপানী কমিকাজী পাইলটদের কথা আমরা ভুলে যাই। অথচ আত্মঘাতী হামলার প্রথম দিক নির্দেশক এই জাপানী পাইলটরা। জাপানি এবং ইহুদী আত্মঘাতীদের শত শত মানুষ হত্যার পিছনে তাদের প্রেরণা ছিল তাদের রাজা, তাদের দেশ এবং তাদের ধর্ম। তাহলে মুসলিম আত্মঘাতীদের উপরেই কেবল নৃশংসতার এ দোষ চাপানো কেনো ? স্লাভক জিজেক[৪৮] মনে করেন, এ ধরনের আত্মনিবেদন এক ধরনের আত্মমগ্নতা। তার মতে নিজের জীবনকে মৃত্যুর কাছে সঁপে দেয়ার বেদনাবহ চরম বিষয়টি বুঝা অত্যন্ত দুরূহ। একজন মানুষ অন্যের জন্য অথবা সার্বজনীন উদ্দেশ্যে নিজের জীবনকে বিলিয়ে দিতে পারার বিষয়টি চিন্তা করাও বড় কঠিন।

আমি মোটেই দাবি করি না যে, মুসলিমরা সন্ত্রাসী হতে পারে না বরং সন্ত্রাসবাদের সাথে ইসলামকে চিত্রিত করা নিয়ে আমার বিরোধিতা । ইসলাম এবং মুসলিমরাই সন্ত্রাসবাদের একমাত্র আলোচ্য হওয়ায় এর বাইরে যারা সন্ত্রাসবাদে লিপ্ত তারা আড়াল হয়ে যাচ্ছে। প্যালেস্টাইন ইস্যু যা মূলত তাদের নিজ ভূমির অধিকার আদায় এবং সম্পূর্ণভাবে একটি সেক্যুলার ইস্যু। অথচ প্যালেস্টাইনী আত্ম নিবেদিত যোদ্ধাদের চিহ্নিত করা হচ্ছে ধর্মীয় উগ্রপন্থী হিসেবে। এরা ইসরাইলী নৃশংসতা এবং অমানবিকতার বিরুদ্ধে শেষ পথ

www.pathagar.com

হিসেবে যে আত্মোৎসর্গের পথে পা বাড়িয়েছে সে বিষয়টির প্রতি কারো কোন উপলব্ধি জাগ্রত হচ্ছে না। অবস্থাটি এমন হয়েছে যে, কে আসল নির্যাতনকারী আর কে নির্যাতিত তার নির্ণয় ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। উপনিবেশ আমলে যে সন্ত্রাস এবং সহিংসতা ছিল সে কথাও মানুষ ভুলে গেছে। ফ্যানন [৪৯] মনে করেন যে, পৃথিবীতে সহিংসতা এখন তার পূর্ণ চরিত্র নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। তার মতে আলজেরিয়াতে ফ্রান্সের উপনিবেশকালে ফ্রান্স তার বৈধতা গ্রহণের জন্য শক্তি প্রয়োগ এবং বিভিন্ন ছলচাতুরীর আশ্রয় [৫০] নিয়েছিল বটে তবে ফ্রান্স কিছুটা হলেও আইনের আবরণ দিতো। এতে কিছুটা হলেও নৈতিকতা ছিল, আইনের দিকটি দেখা হতো। এরপরও আলেজেরিয়ার মানুষ ঔপনিবেশিক শাসনকে বর্বরতা, অনৈতিক এবং আইনহীনতা আখ্যা দিয়ে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল। ফ্রান্স যদিও সে বিদ্রোহকে উন্মত্ততা বলে অভিহিত করে। ফ্যানন উল্লেখ করেছেন ফ্রান্স তারপরেও পুরো ব্যাপারটিকে শক্তি দিয়ে দমন করার কথা উচ্চারণ করেনি। প্রকৃত ব্যাপার হলো পরাধীন মানুষ স্বাধীন হবার জন্য বিভিন্ন রূপে সংগ্রাম করেই যাবে। [৫১] উপনিবেশভুক্ত মানুষ সে আলজেরিয়ান হোক অথবা প্যালেস্টাইনী হোক তার অস্তিত্বের প্রয়োজনে তাকে সহিংস হতে হয়। তবে বর্তমানে এ বিষয়টি জটিল উপনিবেশবাদী আগ্রাসনের সহিংসতা এবং বর্তমান দুনিয়ার সহিংসতার মধ্যে রেখা টানা এক কঠিন ব্যাপারই বটে। [৫২]

ফ্রান্সের অধিকৃত আলজেরিয়া এবং ইসরাইল অধিকৃত প্যালেস্টাইনের মধ্যে কার সাদৃশ্যকে কখনও বিবেচনা করা হয়নি। সাংবাদিক রবার্ট ফ্রিস্কের মন্তব্য : "ইসরাইল এবং প্যালেস্টাইন সংঘাতের বাস্তবতা হলো এটি সর্বশেষ উপনিবেশ যুদ্ধ। এর আগে ফ্রান্স সর্বশেষ উপনিবেশ যুদ্ধ করেছিল। তারা বহু আগে আলজেরিয়াকে জয় করে। সেখানে অর্থাৎ উত্তর আফ্রিকায় চোখ জুড়ানো উর্বর ভূমির ওপর তারা কৃষি খামার গড়ে তোলে। এক সময়ে যখন আলজেরিয়ানরা তাদের স্বাধীনতার দাবি তোলা শুরু করে তখন ফ্রান্স তাদেরকে 'সন্ত্রাসবাদী' বলে চিহ্নিত করে। যারা বিক্ষোভে অংশ নিচ্ছিল তাদেরকে গুলি করে হত্যা করে আর যেসব মানুষ গেরিলা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা শুরু করে তাদের নির্মূল করার জন্য নির্যাতনের পথ বেছে নেয় এবং পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড শুরু করে। [৫৩] ইসরাইল এবং প্যালেস্টাইনেও ইতিহাসের সে পুনরাবৃত্তি চলছে অথচ আমরা অধিকাংশই সে দিকটির প্রতি উপেক্ষা করার নীতিকেই গ্রহণ করেছি।

এরপরও তর্কের খাতিরে যদি স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ এবং সন্ত্রাসবাদের মধ্যে একটি পার্থক্য চিহ্নিত করার চেষ্টা করি তাতে দেখা যাবে এর ভেতরকার সহিংসতার চেয়ে বরং এর সংজ্ঞার পার্থক্যই মূল কথা হয়ে আসে। উভয়টির নামকরণের পিছনে যে শক্তিগুলি রয়েছে তাদের স্বার্থ সুবিধাগুলির প্রতি চোখ রাখলেই সন্ত্রাসবাদ ও স্বাধীনতা সংগ্রাম চিহ্নিত করার পার্থক্য সহজে স্পষ্ট করা যায়। মূলত : এ সকল শক্তির দ্বারা বিভিন্ন অঞ্চলের রাজনৈতিক মতবিরোধের বিষয়গুলোকে [৫৪] সন্ত্রাসবাদ হিসেবে চিহ্নিত করা হচ্ছে। ফলে আমেরিকার বিশেষনীতি (যথা : ইসরাইলকে সমর্থন, ইরাকের উপর অবরোধ এবং বোমা বর্ষণ, স্বৈরাচারী শাসককে সমর্থন ইত্যাদি) - মুসলমানদের

www.pathagar.com

সমালোচনাকে অন্যায়ভাবে ধর্মীয় উগ্রবাদ অথবা ইসলামী সহিংসতা [৫৫] নামক নতুন নতুন অভিধায় চিহ্নিত করা হয়। এরকমের আচরণ আসলে মুসলিমদের রাজনৈতিক মত পোষণের যে অধিকার রয়েছে তা অস্বীকার করা এবং স্পষ্ট জুলুম ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে সংঘটিত ন্যায়সঙ্গত প্রতিবাদ বা প্রতিরোধকে উপেক্ষা করার সমান।

সর্বশেষ অবস্থা হলো, সন্ত্রাসবাদ কেবলই যুদ্ধ নয় বরং সে সব ন্যায়ের যুদ্ধ যেমন 'সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে আমেরিকার যুদ্ধ।' [৫৬] মধ্যযুগের মুসলিমদের জিহাদের নীতি অর্থাৎ বেসামরিক ও নিরাপরাধ মানুষ হত্যা না করার মত একই রকমের হত্যাকাণ্ড পরিচালনার যুদ্ধ। অতএব, নতুন করে ন্যায় যুদ্ধের ব্যাপারে বৃহত্তর সমঝোতা তৈরি করা এবং কি কি বিষয়কে সন্ত্রাসবাদ বলা হবে তা সুস্পষ্ট না করা পর্যন্ত মুসলিমদের যে কোন প্রতিরোধ আন্দোলনকে সন্ত্রাসবাদ বা অন্যায় কাজ আখ্যা দেয়া অবশ্যই একটি অসাধু কর্ম।

ভুল বুঝাবুঝির রাজনীতি

সাধারণ আমেরিকানদের বেশীরভাগই জিহাদ, পবিত্র যুদ্ধ এবং সন্ত্রাসবাদের মধ্যে যে তত্ত্বগত পার্থক্য রয়েছে তা বুঝতেই পারে না। কারণ ইসলাম সম্বন্ধে তাদের তেমন জ্ঞান নেই অথবা যা আছে তা অতি সামান্য। তাদের এই অজ্ঞতার ইতিহাস বুঝার জন্য চতুর্দশ শতাব্দীতে ইসলামের সাথে ইউরোপের যে মুখোমুখি অবস্থান ছিল তার ধারাবাহিকতাকে স্মরণ করতে হবে। তখনকার ঐ ইউরোপীয় চিন্তাধারাকে আমরা এখনও যাকে পাশ্চাত্য বলে জ্ঞান করি ইসলামের ব্যাপারে ঐ পাশ্চাত্যের আওতাটুকুও একই রকমের। ইসলাম সম্বন্ধে ইচ্ছাকৃতভাবে এই ভুল বুঝাকে প্রথম কারণ বলে মনে করি। আর ঐতিহাসিকভাবে যে কারণ সেটা হলো, ইসলামকে মনে করা হয় ইহুদী ও খ্রিস্ট ধর্ম পবিত্যাগকারী এক ধর্মদ্রোহী সম্প্রদায়। তারা এও মনে করে যে ইসলাম উগ্রবাদী এক ধর্ম অথচ ইসলামের অনেক বৈশিষ্ট্যে খ্রিস্ট ও ইহুদী ধর্মের সাথে মিল আছে যা তাদের জানা নেই। জিহাদ এবং সন্ত্রাসবাদের মধ্যে পার্থক্য না করার বিষয়টি তাদের মনস্তাত্ত্বিক। দ্বিতীয়ত : পবিত্র যুদ্ধের অর্থও এখানে ভুলভাবে করা হয়েছে। অথচ এগুলোর মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য থাকলেও এর একটি অন্যটি থেকে আলাদা। [৫৭]

ইসলামকে বুঝার জন্য ইউরোপীয় এই ভুল সম্বন্ধে আর ডব্লিউ সাদার্ন [৫৮] এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন যে, ইসলাম সম্বন্ধে ইউরোপের অজ্ঞতা বা বিভ্রান্তি মূলত সময়ের ব্যবধানের কারণে ঘটেছে। ইসলামকে দেখা হয়েছে বাইবেলের ব্যাখ্যাকে ভিত্তি করে যার ফলে সমস্যাটি আরও তীব্রতর হয়েছে। অথচ ইসলামের মর্ম অন্বেষণ করা হয়নি। এ অজ্ঞতা খ্রিস্টীয় ইতিহাসের মধ্যে একটি স্থায়ী আসন করে নিয়েছে। সাদার্ন আরো বলেছেন : এই ভুল এবং সন্দেহ ইউরোপীয় মনস্তত্ত্বের মধ্যে যেভাবে স্থান করে নিয়েছে তা মোটেই মুছে যাবার নয়।" মুসলিম স্পেনের ইউরোপীয়রা মূলত : এ সন্দেহের বীজ বপন করে ছিল। [৫৯] আর বর্তমানের ইউরোপীয়রা মনে করে তাদের পূর্ব-পুরুষ ইউরোপীয়রা মুসলিমদের আসল স্বরূপ বিস্তারিতভাবে জানতো এখন যদিও তারা তেমনটা জানে না। তাদের মতে, খ্রিস্টধর্মের অস্বীকারকারীরাই খ্রিস্টান বিরোধী। [৬০]

www.pathagar.com

প্রথম ক্রুসেডের সফলতার পর খ্রিস্ট জগতে ইসলামের বিরুদ্ধে যাবতীয় মিথ্যা এবং কাল্পনিকতার এক জোয়ার শুরু হয়। তবে এর মধ্যে কিছু সত্যের প্রলেপ থাকতেও পারে।[৬১] ফলে সে সব কিংবদন্তী এবং উদ্ভট কল্পনারাজি অল্পবিস্তর সত্য হিসেবে ইউরোপীয়দের মধ্যে স্থায়ী হয়ে আছে এবং মুসলিমদের নিয়ে আলোচনাকালে সেসব বিষয় অবতারণা করা হয়। আর এ ধারণা এক বংশধারা থেকে আরেক বংশধারায়, এক শতাব্দী হতে আরেক শতাব্দীতে প্রবাহিত হচ্ছে।[৬২] ইউরোপীয়রা ইসলামকে নিয়ে ফ্রান্সিস ব্যাকনের আগে কোনরূপ তত্ত্বগত বা দার্শনিক আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়নি। অথবা ইসলামের কোন দাবির মুখোমুখি হয়নি বা খন্ডন করেনি। ইসলামের ব্যাপারে ইউরোপীয়দের মনোভাবকে মি. সাদার্ন এভাবে আখ্যায়িত করেছেন : "এর কারণ প্রথমত : বাইবেলের ব্যাখ্যা ; দ্বিতীয়ত : অসত্য কল্পনা এবং সবশেষে অত্যন্ত অল্পসময়ব্যাপী দার্শনিক বিবাদের ফল"।[৬৩]

আমি দু'টো বিষয়কে স্পষ্ট করার জন্য আলোচ্য প্রবন্ধকে বেছে নিয়েছি। প্রথমটি : ইসলামকে বুঝার পাশ্চাত্যের সমস্যা। পাশ্চাত্যের নিজস্ব মনস্তত্ত্ব, জীবনাচারের উত্তরাধিকার এবং পরিবর্তনশীলতার আলোকে ইসলামকে বুঝা[৬৪] বাস্তবিকই এটি একটি বড় সমস্যা। দ্বিতীয়টি : ইসলাম ও মুসলমানদের নিয়ে মধ্যযুগ হতে সৃষ্ট ভয়ভীতি এবং নানা কল্পকাহিনী যা বংশপরম্পরায়[৬৫] বর্তমান বুদ্ধিবৃত্তিক আলোচনার ওপরেও ছায়া বিস্তার করে আছে। যার তাজা উদাহরণ হলো : 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধকে ব্যাখ্যা করার সময় প্রেসিডেন্ট বুশ একে ক্রুসেড বলে কেন যে বর্ণনা করলো ? (যদিও শব্দটির ব্যবহার নিয়ে পরে অনেকেই সমালোচনা করেছেন। এর কারণ এ বিশেষ শব্দটির সাথে ইতিহাস এবং অতীতের তাড়না মিশে আছে। পশ্চিমের বহু মানুষ কেনো হাইজ্যাকারদের কর্মকাণ্ডকে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে না দেখে বাইবেলে বর্ণিত ঘটনাদির আলোকে বিচার করে ? কেনো গণমাধ্যমগুলিতে এসব ঘটনাকে খ্রিস্টান ও ইহুদীদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের ক্রোধ, প্রতিশোধ গ্রহণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয় ? কেনো পশ্চিমের অধিকাংশ মানুষ পৃথিবীর একশত কোটি মুসলমানকে বিন লাদেন, তালিবান এবং হাইজ্যাকারের একই কাতারে গণ্য করে এবং সন্ত্রাসীদের কাজকে ইসলামের আসল রূপ বলে ব্যাখ্যা করে ? কেনো 'ইসলাম বিষয়ক' কথিত পশ্চিমা পণ্ডিত বার্নার্ড লুইস মুসলিম সমাজের ইতিহাস লিখতে গিয়ে অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজ মনস্তত্ত্বের আলোচনা না করে যেখানে যেখানে হিংসা-বিদ্বেষের উপাদান রয়েছে সেসব নাড়াচাড়া করে ক্রোধ জাগানো, অভিযুক্ত করা এবং অপরাধী চিহ্নিত করে খোলাখুলি জাতি বিদ্বেষে নামলেন ?[৬৬]

অবশ্য কেউ যখন কারো ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করে তখন সে দায়িত্ব তার ব্যক্তির ওপরই বর্তায়। এসব পণ্ডিতেরা ইসলামের অসত্য রূপ বর্ণনা করে নিজেদের বিতর্কিত করেছেন বটে অন্যদিকে এর ফলে আমেরিকার 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের' নৈতিকতার মানকে নিম্নমুখী করে দিয়েছেন। এ যুদ্ধে সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে লক্ষ্য স্থির থাকলেও বেঘোরে নারী-শিশু প্রাণ হারাচ্ছে এবং অসামরিক প্রতিষ্ঠাগুলিকে ধ্বংস করা হচ্ছে। তারা এবং

www.pathagar.com

মুসলিমদেরকে সন্দেহভাজন সন্ত্রাসী হিসেবে চিহ্নিত করে প্রতিটি আমেরিকানের জীবনকে শত্রুর নজরদারীর মধ্যে এনে ঝুঁকিপূর্ণ করে তুলেছে। এ অবস্থাকে স্বদেশ এবং স্বজাতির প্রতি অতিরিক্ত ভালবাসা প্রদর্শন হিসেবে দাবী করা যায় বটে তবে এর ভিতরেই ইসলাম ও মুসলিম সম্বন্ধে আমেরিকানদের ভ্রান্তি ভুল রাজনীতিকেই এগিয়ে নিচ্ছে।

চরমপন্থীদের ব্যাখ্যার মুখোমুখি

এটা বলা সহজ যদি আমরা ইসলামকে ভুল বুঝার কারণ হিসেবে কেবলই পাশ্চাত্যকে অভিযোগ করি। এ অভিযোগের দোষে সমানভাবে মুসলমানরাও দায়ী। বিন লাদেন, হাইজ্যাকার এবং তালিবানদের চরম ব্যাখ্যাকে কী ইসলামের আসল ব্যাখ্যা হিসেবে সাধারণ মুসলিম মেনে নিতে পারে? ইসলাম সম্বন্ধে তালিবানদের যে ব্যাখ্যা তার জবাবে মধ্যপন্থী বা ভারসাম্যপূর্ণ কী কোন মতামত মুসলিমরা ব্যক্ত করেছে? তালিবানদের ব্যাখ্যার বিপরীতে মধ্যপন্থীরা তার সঠিক উত্তর প্রদান করে নি। আমার বক্তব্যটিও হয়তো চরম মনে হতে পারে। তবে আমার চিন্তা হলো উগ্রবাদীতা এবং তার স্বপক্ষে দাঁড় করানো ব্যাখ্যাবলী নিয়ে। আমি আরো বেশী উদ্বিগ্ন যে, এরকম অবস্থা থেকে মুসলমানরা বেরিয়ে আসার জন্য কোন পথ বেছে নিতে পারে কিনা?

এ ধরনের চরম ব্যাখ্যা সবিস্তারে পড়ার সময় দেখতে পাই যে, কুরআনের মধ্যে সংঘাত ভিত্তিক এবং নারী বিষয়ক [৬৭] আয়াতগুলির দিকে এরা বেশী টার্গেট করে থাকে। আমার মত হলো, কুরআন কী বলেছে তাকে বুঝতে হলে কুরআন পাঠকারীকেও বুঝতে হবে। পাঠকারী কিভাবে এবং কী প্রেক্ষিতে তা পাঠ করছে। কুরআনের অর্থ যে সময়ে পড়া হচ্ছে অবশ্যই সে সময়ের প্রেক্ষিতকে বিবেচনায় নিতে হবে। অথচ দুর্ভাগ্যজনক যে, বর্তমানে কুরআন পাঠ করার যে 'কথিত ইসলামী' ধরন তাতে কিন্তু একটি বিপরীতধর্মী অবস্থা বিরাজ করছে। আল্লাহ সম্বন্ধে আমাদের ধারণা কখনই পূর্ণ হবে না। সুতরাং প্রথমেই মুসলিম রাষ্ট্র এবং যারা ইসলামের ব্যাখ্যা দেন তাদের আন্তঃ সম্পর্কের দিকটিকে আমাদের বিবেচনায় আনতে হবে। কিভাবে মুসলিম সমাজে ধর্মীয় কর্তৃত্ব এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্তৃত্বের কাঠামো পরিগঠিত তাকেও গুরুত্বের সাথে দেখতে হবে। এসবের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার আলোকে বুঝতে হবে কেনো মুসলমানরা বিভিন্ন সময়ে ঠিক সে সময়ের এবং স্থানের আলোকেই কুরআনকে পড়েছেন এবং সে মতে বুঝার চেষ্টা করেছেন। আমাদেরকে ইতিহাসের সাথে বর্তমান ঘটনাবলী, মুসলিম রাষ্ট্রগুলির বর্তমান অবস্থা এবং এসব রাষ্ট্রের ভিতরকার ধর্মীয় এবং সেক্যুলার দলগুলির শক্তি ও কর্মকৌশলকে গভীরভাবে বুঝতে হবে। [৬৮]

কোন জ্ঞানই তার পটভূমি এবং তার কালিক ও স্থানিক প্রক্রিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন নতুন কিছু নয়। মানুষের চিন্তাশীল অংশ সামাজিক কাঠামোর অবস্থাকেও জ্ঞান চর্চার মধ্যে শামিল করে। সুতরাং সবকালেই কুরআন পাঠে মুসলিমদের অবস্থা, চেতনা, ইতিহাস সবকিছুকে মিলিয়ে কোন সিদ্ধান্তের কাছে যাওয়া প্রয়োজন। এই পরিবর্তনশীলতার প্রয়োজনীয়তার মধ্যেই কুরআনের মূলপাঠ এবং ব্যাখ্যার পার্থক্য নিরূপিত হয় আর

www.pathagar.com

অন্যদিকে ধর্মীয় জ্ঞানের ক্রমবিকাশ, সংস্কৃতি এবং ইতিহাসসহ অন্যান্য কিছু যুক্ত করার পর নির্ভরযোগ্য যে জ্ঞান পাওয়া যাবে তা দিয়েই আমাদেরকে ইসলাম সম্পর্কিত চরম মতবাদের যাবতীয় জবাব দেয়া দরকার।

আমাদের অবশ্যই অবশ্যই কুরআনের আসল মর্মবাণী বা প্রকৃত অর্থ তালাশ করার জন্য অর্থাৎ কুরআন আমাদেরকে যে রূপে পড়তে বলে সেরূপ পাঠ প্রক্রিয়া শিখে নিতে হবে। অর্থাৎ কুরআনকে-কোনরূপ নির্দিষ্ট পথ ধরে না পড়ে যত সংখ্যক পথ পাওয়া যায় তার সব পথকেই আমাদের তালাশ করতে হবে। সব পথই সমান গুরুত্বপূর্ণ বা যথার্থ তা বলার জন্য এই প্রবন্ধ নয়। এগুলিকে বিবেচনা করার জন্য কুরআনের ভিতরই আমরা তার পথ খুঁজে পাই। যেমন, আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি কুরআন পাঠের মধ্য দিয়ে ইসলামের কোন বিষয়ের সংজ্ঞা বা অর্থকে খুঁজে পাওয়া সম্ভব। যেমন, সিরাতুল মুস্তাকিমের অর্থকে কিভাবে পড়া যায় ? (যার তিনটি অর্থ আমরা পাই : সোজা পথ, মধ্যপন্থা এবং ভারসাম্যপূর্ণ পথ) এ আয়াতে আমাদেরকে সতর্ক করে বলা হয়েছে, ধর্মের ব্যাপারে কোনরূপ বাড়াবাড়ি না করা এবং কোনরূপ চরম ব্যাখ্যা বা কোনরূপ সংকীর্ণ ব্যাখ্যার আশ্রয় না নেয়ার জন্য।

উপরের সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণে দু'টি বিষয় স্পষ্ট। প্রথমটি : কুরআনকে ব্যাখ্যা করার চরম পদ্ধতির পিছনে কতগুলি বিশেষ ধরনের যুক্তিবোধ রয়েছে এবং যা বর্তমানের মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক নেতৃত্বের চিন্তা ও মানসের সাথে সম্পর্কিত। অথচ বিপরীতভাবে, যে সব বাহ্যিক কারণ বিশেষ করে পশ্চিমা আধিপত্যবাদ এবং নীতিকৌশল আমাদের চিন্তাধারার ওপর প্রভাব বিস্তার করছে তা উপলব্ধি করা প্রয়োজন এবং দ্বিতীয়টি হলো মুসলমানরাও কোনরূপ আধিপত্যবাদী বা কাউকে শৃঙ্খলিত করার স্বপক্ষে কুরআনের ব্যাখ্যাকে আশ্রয় করবে না। কারণ কুরআন নিজেই আমাদেরকে দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্তি দিয়েছে।

যে চরমপন্থী ব্যাখ্যার কথা আমি তুলে ধরছি তা কিন্তু কেবলই চরমপন্থীদের ফসল নয়। এর পেছনে মধ্যপন্থী মুসলমানদের নিস্পৃহ মনোভাবও যুক্ত। এদের অনেকেই জড়বুদ্ধির মত মনে করেন যে "ইসলামী মতবাদ তো ইসলামেরই"। এরই সুযোগ নিয়ে জনৈক আলজেরীয় নারীবাদী পশ্চিমা দেশসমূহে এমন একটি প্রামাণ্য ছবি প্রদর্শন করেন যা তাদেরকে তৃপ্তি দেয় এবং ঐ সব দেশের প্রশংসা লাভ করে।

এ হলো আমাদের বর্তমান ভাগ্য। এ নিয়তিকে মেনে নেওয়ার মধ্যে আমাদের সকল ভুল বুঝাবুঝি এবং প্রকৃত রাজনৈতিক দায়িত্ব স্বীকার করার নিহিত আছে। আর তারই সুযোগে ঐসব কথিত ইসলামপন্থীরা বলে বেড়ায় যে, মধ্যপন্থীরা ইসলামের ব্যাখ্যা খুঁজে বটে যা তাদেরকে কেবল বিপক্ষ শক্তির শিকারগ্রস্তই করছে।

দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপারটি হলো এই যে, বর্তমান সময়ের মুসলমানরা এই সব চরমপন্থীদের প্রতি অনেকটা মোহগ্রস্ত হয়ে পড়ছে। এর কারণ খুঁজলে এমনটাই মনে হয় যে, বর্তমানের অধিকাংশ মুসলমানদের মধ্যে একটি বদ্ধমূল ধারণা মুসলিম হিসেবে তাদের

www.pathagar.com

যা কর্তব্য অর্থাৎ ইসলামের প্রতি তাদের যা করণীয় তারা সঠিকভাবে বা পুরোপুরি তা পালন করছে না। ফলে যে পাপবোধ তাদের তাড়া করছে, তারই সুযোগ গ্রহণ করছে এ চরমপন্থীরা। কিন্তু বাস্তবতা হলো এগারই সেপ্টেম্বরের পরে যে বিশ্ববাস্তবতা তারই আলোকে আমাদের উচিত হবে ঐসব চরম ব্যাখ্যা থেকে আমাদেরকে মুক্ত করা। আমাদের উচিত হবে উদার বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে কুরআন পাঠ করার দায়িত্ব গ্রহণ করা এবং তখনই সার্বজনীনতার কাঠামোতে নতুন ব্যাখ্যার জন্ম হবে এবং আমরা ভারসাম্যপূর্ণ বিকল্প খুঁজে পাব।

শেষ কথা

সব কথার শেষে আমি মনে করি কুরআনের আয়াতের চরমপন্থী ব্যাখ্যার মধ্য দিয়ে প্রকৃত অর্থে কুরআনের আসল মর্মকে আড়াল করা হয়ে থাকে। আর তাই আমাদের কর্তব্য হবে চরম ব্যাখ্যার বিপরীতে ইসলামের ব্যাখ্যায় সঠিক পথটি অনুসরণের জন্য নতুনভাবে চিন্তার সূত্রপাত করা। দীর্ঘ সময় ধরে কুরআন পাঠের এবং চর্চার যে নিয়মটি মেনে আসছি তাতে কুরআনের মধ্যে যে সার্বজনীন আহ্বান রয়েছে তাকে ক্ষতিগ্রস্ত করা হচ্ছে। যার ফলে আমরা আমাদের প্রকাশ করতে পারিনি। আমাদের মাঝে ক্রমাগত জন্ম নিয়েছে বা নিচ্ছে চরমপন্থী মনোভাব, নারী বিদ্বেষ এবং সহিংসতা এবং এই হিংসাকে ধারণ করার জন্য আমরা ঐ ধরনের অনুকূল ব্যাখ্যা গ্রহণের চেষ্টা করছি। সুতরাং, আজ চিন্তার বড় দাবী আমাদেরকে নতুন ব্যাখ্যায় কালামে পাকের জ্ঞান আহরণ করতে হবে যার মধ্যে থাকবে সকল মানুষের যাবতীয় অধিকারের পূর্ণ গ্যারান্টি। সব মানুষের ধর্মীয় স্বাধীনতা নিশ্চিত হবে। ধর্ম নিরপেক্ষতার অন্যতম যে দাবী তাতো কুরআন আগেভাগেই মঞ্জুর করেছে। নতুন ব্যাখ্যার মধ্যে নারী-পুরুষের সমানাধিকার, চিন্তার স্বাধীনতা, বাক স্বাধীনতা, ধর্মের স্বাধীনতা এবং পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে শাসন পরিচালনার মত মানবাধিকারগুলি নিশ্চিত করতে হবে। সকল মানুষের জন্য কুরআন। কুরআনের এই আহ্বানকে আমরা অতি মামুলি বিষয় করে ফেলেছি। কুরআনকে অবলম্বন করে যে নির্যাতন অথবা অধিকার হরণের ব্যাপার আমাদের মাঝে বিরাজ করছে তাকে প্রতারণা ছাড়া অন্য কিছু বলা সমীচীন হবে না। আর এ অবস্থাকে আরো চালিয়ে যাবার সুযোগ দেয়ার অর্থই হবে ইসলামের শত্রুদের সহিংসতা এবং নির্যাতনকে আরো তীব্র করতে দেয়া এবং যার শেষ ফল হবে আমরা নিজেরাই নিজেদের ধ্বংস করে দেব।

তথ্য সূত্র

১। এ শিরোনামের প্রবন্ধটি খসড়া আকারে এপ্রিল ২০০২-এ ওয়াশিংটনের আমেরিকান ইউনিভার্সিটিতে পাকিস্তানে সন্ত্রাসবাদ শীর্ষক সেমিনারে পঠিত হয়।

২। পাশ্চাত্য হলো লাগোয়া একটি ভূ-অবস্থান আর অন্যদিকে ইসলাম হলো একটি জীবন ব্যবস্থার নাম। দু'রূপের এ দু'টির তুলনামূলক আলোচনা মোটেই সঠিক নয়। তৎসত্ত্বেও পশ্চিমের বেশীর ভাগ মানুষ ইসলামকে পাশ্চাত্যের বিপরীতে দাঁড়

www.pathagar.com

করানোর ফলে আলোচনাকে যৌক্তিক পর্যায়ে নিয়ে যেতে আলোচ্য প্রবন্ধে সেভাবেই ইসলামকে তুলনা করা হয়েছে।

৩। ক্রুসেড একটি পবিত্র যুদ্ধের বিষয় সেহেতু জিহাদকে ক্রুসেডের প্রতিশব্দ বিবেচনা করা ভুল।

৪। জেমস টার্নার জনসন ঃ দি হলি ওয়ার আইডিয়া ইন ওয়েস্টার্ন এন্ড ইসলামিক ট্রাডিশনস। ইউনিভার্সিটি পার্ক পিএ : পেনস্যালভেনিয়া ইউনিভার্সিটি, ১৯৭৭

৫। ৪ -এ উল্লেখিত বইয়ের পৃষ্ঠা ৩

৬। মার্সেল এ সার্ড, জিহাদ : অ্যা কমিটমেন্ট টু ইউনিভার্সেল পিস। ইন্ডিয়ানাপোলিস আই এন : আমেরিকান ট্রাস্ট পাবলিকেশন্স, ১৯৮৮ : পৃষ্ঠা ২৭।

৭। জনসন : দি হলি ওয়ার, পৃষ্ঠা ৬১

৮। জনসন : দি হলি ওয়ার, পৃষ্ঠা ৩৬

৯। সার্ড : জিহাদ, পৃষ্ঠা ৩৪

১০।ঐ : পৃষ্ঠা ২৩

১১। মুহাম্মদ আসাদ, দি ম্যাসেজ অব দ্যা কুরআন (জিব্রান্টার : দার-আল আন্দালুস, ১৯৮০), পৃষ্ঠা ৫১২

১২। ঐ : পৃষ্ঠা ১১৮

১৩। ঐ : পৃষ্ঠা ৪১

১৪। আমেরিকা হিরোশিমা এবং নাগাসাকিতে তখনই বোমা ফেলে যখন জাপানীরা আত্মসমর্পনের শর্তাদির বিষয়ে প্রচার করছিল। আর উপসাগরীয় যুদ্ধের সময় আমেরিকান সৈন্যরা পলায়নরত এক লক্ষ সৈন্যের ওপর গোলা বর্ষণ করে যাকে আমেরিকান জেনারেল 'ডাক শুট' নামে অভিহিত করে।

১৫। দ্রষ্টব্য, আসাদ : দ্য ম্যাসেজ অব দ্যা কুরআন, পৃষ্ঠা ৪১, টীকা ১৭০

১৬। যখন কুরআনের ঐ আয়াত নাযিল হচ্ছিল ঠিক সে সময় মুসলমানরা তাদের দ্বীন পালনের কারণে নির্যাতিত হচ্ছিল।

১৭। সার্ড : জিহাদ, পৃষ্ঠা ৮৩

১৮। আসমা বারলাস : বিলিভিং উইমেন ইন ইসলাম (অস্টিন টি এক্স : ইউনিভার্সিটি টেক্সাস প্রেস, ২০০২)

১৯। সার্ড : জিহাদ, পৃষ্ঠা ২৩

২০। ক্যারেন আর্মস্ট্রং, ইসলাম, এ শর্ট হিস্ট্রি (নিউইয়র্ক, মডার্ন লাইব্রেরী, ২০০২), পৃষ্ঠা ৩০

২১। ঐ : পৃষ্ঠা ৯

২২। জনসন : হলি ওয়ার, পৃষ্ঠা ৬৬

২৩। ঐ : পৃষ্ঠা ৭

২৪। ঐ : পৃষ্ঠা ৭

www.pathagar.com

২৫। ঐ : পৃষ্ঠা ৮-৯

২৬। আর্মস্ট্রং : ইসলাম, পৃষ্ঠা ৯০

২৭। জনসন : হলি ওয়ার, পৃষ্ঠা ৬৩

২৮। সার্ড : জিহাদ, পৃষ্ঠা ২৭

২৯। আর্মস্ট্রং, ইসলাম, ২৯

৩০। জনসন, হলি ওয়ার ৯৬

৩১। ঐ, পৃষ্ঠা ১৫

৩২। ফ্রান্সিস রবিনসন সম্পাদিত : ক্যামব্রিজ ইলাস্ট্রেটেড হিস্ট্রি : ইসলামিক ওয়ার্ল্ড (ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, কেমব্রিজ, ১৯৬৬), পৃষ্ঠা ১৭৩

৩৩। দ্রষ্টব্য, সার্ড : জিহাদ এবং জামিলা কালোকোট্রেনিস, ইসলামিক জিহাদ : এন হিস্টোরিক্যাল পারস্‌পেকটিভ, ইন্ডিয়ানাপলিস, আই এন, আমেরিকান ট্রাস্ট পাবলিকেশনস্‌ ১৯৬৬, পৃষ্ঠা ১৯৯৬

৩৪। আর্মস্ট্রং : ইসলাম, পৃষ্ঠা ১৬৬

৩৫। দ্রষ্টব্য, জন কূলে : আনহলি ওয়ারস্‌ : আফগানিস্তান, আমেরিকা এন্ড ইন্টারন্যাশনাল টেরোরিজম: প্লুটো প্রেস ২০০২, লন্ডন এবং জন এসপসিটো : আনহলি ওয়ার : টেরোর ইন দ্যা নেম অব ইসলাম, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০০২

৩৬। ডেভিড জাইদান, "দ্যা ইসলামিক ফান্ডামেন্টালিস্ট ভিউ অব লাইভ এজ এ পেরিনিয়াল ব্যাটল, মিডল ইস্ট রিভিউ অব ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স জার্নাল, এডিটেড বাই ব্যারি রুবিন, ডিসেম্বর ২০০১, পৃষ্ঠা ৫

৩৭। দ্রষ্টব্য, নায়ীম ইনায়েত উল্লাহ এবং ডেভিড বেলানীর ইউরোপীয় খ্রিস্টানদের মতামত সংক্রান্ত আলোচনা, অধ্যায় ২

৩৮। আবদুল্লাহ ইউসুফ আলী : দ্যা হলি কুরআন টেক্স্ট, ট্রান্সলেশন এন্ড কমেন্ট্রি, তাহরিক তারসিলে কুরআন, ১৯৮৮, নিউইয়র্ক, পৃষ্ঠা ২৫৮-৫৯

৩৯। ঐ, পৃষ্ঠা ১৪০৭

৪০। মেরিল ওয়াইন ডেভিস : নোয়িং ওয়ান অ্যানাদার : শেইপিং ইন ইসলামিক এনথ্রোপোলজি, ম্যানসেল পাবলিশিং লিমিটেড, ১৯৮৮, লন্ডন, পৃষ্ঠা ৬

৪১। ফজলুর রহমান : মেজর থীমস অব দ্যা কুরআন, বিবলিওথিকা ইসলামিকা ১৯৮০, মিনিয়াপোলিস, পৃষ্ঠা ৯০

৪২। আলী এস আসানী : অন পীস, ভায়োলেন্স এন্ড দ্যা কুরআন ইন্টারনেটে প্রচারিত।

৪৩। বারলাস : 'বিলিভিং উইমেন'

৪৪। দ্রষ্টব্য : ইউনাইটেড স্টেটস, কোড সেকশন ২৬৫৬ (এফ)

৪৫। চার্লস স্মীথ : প্যালেস্টাইন এন্ড অ্যারাব ইসরায়েলী কনফ্লিক্ট, (সেন্টমার্টিন প্রেস, ১৯৯২ নিউইয়ক, পৃষ্ঠা ১৯, ১৪০।

www.pathagar.com

৪৬। ঐ, পৃষ্ঠা ১২০

৪৭। ঐ, পৃষ্ঠা ১৪৩

৪৮। স্লাভোক জিজেক : ওয়েলকাম টু দ্যা ডিজার্ট অব দ্যা রিয়েল, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০০১, অন লাইনে প্রচারিত

৪৯। ফ্রান্টজ ফ্যানন : দ্যা রেচেড অব আর্থ, গ্রুভ প্রেস, নিউইয়র্ক, পৃষ্ঠা ৬১

৫০। ঐ, পৃষ্ঠা ৮৪

৫১। ঐ, পৃষ্ঠা ৮৪

৫২। ঐ, পৃষ্ঠা ৮১

৫৩। রবার্ট ফ্রিস্ক : দিস্ টেরিবল কনফ্লিক্ট ইজ দ্যা লাস্ট কলোনিয়াল ওয়ার : ইনডিপেনডেন্ট, ৪ ডিসেম্বর ২০০১

৫৪। মিডিয়ার একাংশ আফগানরা যখন সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছিলো তখন তাকে বলা হলো মুক্তি সংগ্রাম, আর যখন আমেরিকার বিরুদ্ধে একই কারণে যুদ্ধ শুরু হলো তখন এর নাম হলো টেরোরিজম।

৫৫। বস্তুত দুনিয়ার সকল মুসলিম এবং বিবেকবান মানুষ এই নীতিকে নৈতিক এবং রাজনৈতিকভাবে মোটেই অনুমোদন করে না।

৫৬। দ্রষ্টব্য, হাউয়ার্ড জিন্ : এ জাস্ট কজ, নট এ জাস্ট ওয়ার, দ্যা প্রগ্রেসিভ, ডিসেম্বর ২০০১

৫৭। এ শব্দ মানার জন্য ইথাকা কলেজের শিক্ষক জোনাথেন গিলের নিকট ঋণ স্বীকার করছি।

৫৮। আর ডাব্লিউ সাউদার্ণ : ওয়েস্টার্ন ভিউজ অব ইসলাম ইন দ্যা মিডল এজেস, হাভার্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১২৬২, কেমব্রিজ, পৃষ্ঠা ১৭

৫৯। সাদার্নের এই মন্তব্য কী অর্থ বহন করে তা আমার বোধগম্য নয়।

৬০। সাদার্ন : ওয়েস্টার্ন ভিউজ, পৃষ্ঠা ২৫

৬১। ঐ, পৃষ্ঠা ১৪,২৮

৬২। ঐ, পৃষ্ঠা ১২৯

৬৩। ঐ, পৃষ্ঠা ৬৭

৬৪। ঐ, পৃষ্ঠা ৪

৬৫। হ্যা, এ অভিমতের বিপরীতে কৌতুহলোদ্দীপক প্রশ্ন উঠাই স্বাভাবিক।

৬৬। পল কেনেডির বুক রিভিউ : হোয়াট ওয়েন্ট রং, বার্নার লুইস, নিউইয়র্ক টাইমস্ বুক রিভিউ, ২৭ জানুয়ারী ২০০২, পৃষ্ঠা ৯

৬৭। বারলাস : বিলিভিং উইমেন

৬৮। ঐ

www.pathagar.com

ইসলাম ও সন্ত্রাস

মূল : ড. আবদুর মুগনী ।। অনুবাদ : নুরুল ইসলাম সরকার

বর্তমান বিশ্বে সন্ত্রাস একটি বাস্তব ঘটনা। এটি একটি বহুমাত্রিক বিষয়। শিল্প বিপ্লবোত্তর সভ্যতার এটি একটি ভয়ানক পরিণতি। বৈজ্ঞানিক জড়বাদের সুবাদে ইতোমধ্যেই গুরুতর ভুল হয়ে গিয়েছে। ডারউইনের বিবর্তনবাদ এবং ফ্রয়েড উদ্ভাসিত জীবনের জটিলতার উপর মনোবিজ্ঞানের গভীর মনোনিবেশ এবং মার্কসীয় জীবনাচরণ জীবন বৃত্ত, মনন এবং অর্থনীতির উপরে প্রভাব বিস্তার করেছে। স্বার্থবাদিতা ও ক্ষোভের মধ্যে লালিত সন্ত্রাসীরা সমাজের অসন্তুষ্ট এবং সবকিছু পেতে ইচ্ছুক এমন একটি জনগোষ্ঠী।

পশ্চিমা ধারণার একটি আলোচিত বিষয় আত্মবিশ্বাসের সংকট। এখানে কেউ কাউকে বিশ্বাস করে না। প্রত্যেকে প্রত্যেককে প্রতারিত করতে চায়। জীবনের কোন আদর্শ মানুষকে অনুপ্রাণিত করে না। তারা শুধু চাতুরীপূর্ণ জীবনমান অর্জনের জন্য লালায়িত। নৈতিক মূল্যবোধ তাদের কাছে মূল্যহীন। রাজনৈতিক বিবেচনাতেই তারা পরিচালিত হয়। এখানে সর্বত্রই আধিপত্যের প্রতিযোগিতা দেখা যায়। এ অবস্থার পরিপেক্ষিতে সন্ত্রাসের ভারসাম্য রক্ষায় অস্ত্রের উৎপত্তি হচ্ছে। অস্ত্রের ভাণ্ডার স্বাভাবিকভাবেই প্রলুব্ধ করছে স্বেচ্ছাচারী বা অত্যাচারীকে। কিছু লোক অগ্রগতির ফল একচেটিয়াভাবে ভোগ করছে। অন্যরা তাদের এ একচেটিয়া কারবার দেখে দেখে অসন্তোষে ফুঁসছে। সম্প্রসারণবাদী মহাশক্তিশালী এ চক্র মানবতার দুর্বল অংশকে প্রভাবিত করছে; মানবতার এ অংশটি উদ্বেগ উৎকণ্ঠা আর আতঙ্কের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছে। শক্তি প্রয়োগে যারা সক্ষম নয় তারা শক্তিমানদের মুষ্ঠি থেকে তাদের দাবিকৃত অংশ ছিনিয়ে নেয়ার জন্য লুণ্ঠনের পথ বেছে নিচ্ছে। তারা তাদেরকে নিন্দা করছে জবরদস্তি দখলকারী হিসেবে। ভীতি ও হীনমন্যতায় তারা ঘৃণার মহা সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হয়। যারা অত্যাচার নির্যাতনের শিকার হয় তারা তাদের নিগ্রহকারীদের প্রতিশোধের আগুনে জ্বলে ওঠে।

উৎপত্তি

সন্ত্রাস ব্যক্তি বা গ্রুপ ভিত্তিক হয়ে থাকে। রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের উস্কানিতেও সন্ত্রাস মাঝে মাঝে উৎসাহিত হয়। সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছড়িয়ে পড়ছে সহিংসতা। ভীতি প্রদর্শন ও জোর করে অন্যায় দাবী আদায় বর্তমান কালের নিয়মে পরিণত হয়েছে। যারা সন্ত্রাস ও কাউন্টার সন্ত্রাসে জড়িত, কোন আইন বা নীতিই তাদেরকে শৃঙ্খলাবদ্ধ বা নিয়ন্ত্রণে ফিরিয়ে আনতে পারছে না। দস্যুরা আইন ও সমাজের আশ্রয় পায় না। কিন্তু মদদ দানকারীদের সহযোগিতায় তারা দুর্বলদের উপর আক্রমণ চালিয়ে থাকে।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে (১৯৩৯-১৯৪৫) বিজয়ী শক্তির দ্বারা একটি বড় দুষ্ট চক্র সৃষ্টি হয়। এ যুদ্ধে মিত্রবাহিনীর কাছে নাৎসীবাদ ও ফ্যাসিবাদ পরাজিত হয়। এরপরও পরাজিত শক্তি ইহুদীবাদকে সমর্থন করে এবং উপনিবেশবাদ থেকে কখনও ফিরে আসেনি। এর ফলে আলজেরিয়ার উপর ফ্রান্সের আগ্রাসন ও প্যালেস্টাইনের উপর ইসরাইলী আগ্রাসনে অনেক গেরিলার জন্ম হয়। তারা আলজিরিয়াতে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে সফল হলেও ইসরায়েলের বিরুদ্ধে এখনও তারা সংগ্রাম করে যাচ্ছে। আল-ফাতাহ্ আন্দোলনের সফল কমান্ডোগণ তাদের মাতৃভূমি পুনরুদ্ধারে এবং বর্তমানকালের ফ্যাসিবাদের শৃংখল থেকে তাদের জনগণকে উদ্ধার করতে আজো সংগ্রাম করে যাচ্ছে। ভিয়েতনামে যা ঘটেছিল তা ক্ষুদ্র মানবগোষ্ঠীর ওপর বড় শক্তিগুলোর সন্ত্রাস ছাড়া আর কিছু নয়। এ ঘটনা আমাদেরকে তদানীন্তন আফগানিস্তানের উপর সোভিয়েত আগ্রাসনের কথা মনে করিয়ে দেয়। এ আগ্রাসন মুজাহেদীনদেরকে অদম্য সাহসে যুদ্ধ করতে আরো বেশী অনুপ্রাণিত করে এবং অতি অল্প সময়ের ব্যবধানে আফগান মুজাহেদীনরা তাদের মাতৃভূমি ফিরে পায়।

সহিংসতা

সহিংসতা অবশ্যই সন্ত্রাসবাদের জনক। কোন কিছু অর্জনের জন্য কখনো কখনো সহিংসতা প্রয়োগ করা হয়। এ দার্শনিক প্রশ্নের যথার্থ আলোচনা কিংবা তার উত্তর দান অত্যন্ত কঠিন। এটি স্পষ্ট যে, ধর্মে বিশ্বাস ও ধর্ম পালনে সহিংসতা অনুসরণ যাবে না। এটি শুধুমাত্র আন্দোলনের একটি নীতি হতে পারে। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে বৃটিশ সাম্রাজ্যের অজেয় শক্তির বিরুদ্ধে নীতি ও কৌশলের যে প্রকৃতি ছিল তা সহিংসতার মাধ্যমে অর্জিত হতো না। ১৮৫৭ সালের সশস্ত্র বিপ্লব সহিংসতার জন্য শোচনীয়ভাবে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল।

সুতরাং সাম্রাজ্যবাদী শক্তি এবং সাম্রাজ্যবাদীশক্তির চ্যালেঞ্চকারীদের মধ্যকার স্নায়ু যুদ্ধের নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধকেই একমাত্র নিরাপদ ও নিশ্চিত অস্ত্র বলে গণ্য করা হয়। ভারতীয়রা এটিকে দেশপ্রেমের বহিঃপ্রকাশ মনে করেছিল। তাদের এ দেশপ্রেম এতদূর পর্যন্ত গিয়েছিল যে ভারতের জাতীয় সৈন্যরা নাৎসীদের সঙ্গে তাদের ভাগ্য জড়িয়ে ফেলার পরও সামগ্রিকভাবে তারা জনগণের বীর হিসেবে অভিহিত হয়েছিল। বৃটিশরা যখন দেশদ্রোহিতার অভিযোগে তাদের বিচার করছিল তখন জাতীয় নেতৃবৃন্দ তাদেরকে সমর্থন করেছিল।

ভূমিকার বৈপরীত্যের কারণে হিংসাত্মক ঘটনা ঘটুক আর নাই ঘটুক সন্ত্রাসীরা সমাজ রাষ্ট্রের কাছে যুগে যুগে নিগৃহীত ও অভিযুক্ত হয়েছে। সময়ের ব্যবধানে কোন প্রতিষ্ঠিত শক্তিকে চ্যালেঞ্জকারীরা নিজেরাই হয় শাসক, না হয় স্বাধীনতাকামী কিংবা শহীদ হয়ে প্রশংসিত হয়। তাই ইতিহাসের শিক্ষা যে, কখনো কখনো কোনো বিশেষ ব্যক্তির ওপর কৃত অবিচার সংশোধন করা হয়েছে। সুতরাং সমসাময়িক দৃশ্যমান বিষয়কে প্রেক্ষিত ও দৃষ্টিভঙ্গিতেই বিবেচনা করা উচিত। এরূপ ঘটনা আলজেরিয়া এবং ভিয়েতনামে ঘটেছিল যা এখন আফগানিস্তানে ঘটছে এবং প্যালেস্টাইনেও শীঘ্রই ঘটতে পারে। এগুলো হচ্ছে

www.pathagar.com

চোখের সামনে ঘটে যাওয়া কিছু বিষয়। সুতরাং সবকিছুকে বিদ্রোহ কিংবা হিংসাত্মক ঘটনা হিসেবে অভিহিত করা যাবে না। কিছু মানুষ আত্মরক্ষার জন্য বা তাদের আত্মমর্যাদা রক্ষার জন্য অস্ত্র হাতে নিতে পারে। তারা হিংসাত্মক কাজে লিপ্ত হতে পারে। কমান্ডো কিংবা গেরিলাদের কোন মিশন সফল করার টার্গেট তাদের থাকতে পারে। সন্ত্রাসের উদ্দেশ্য ও প্রক্রিয়াকে তাদের প্রকৃতির উপর বিবেচনা করতে হবে। তাহলেই ঘটনার বিষয় ও কোন ঘটনার সত্যতা প্রকাশিত হবে।

সংজ্ঞায়িত করা কঠিন

সন্ত্রাসবাদকে সংজ্ঞায়িত করা কঠিন। জাতিসংঘ এ ইস্যুটির ওপর ১৯৭২ সালের ১৮ ডিসেম্বর হতে ১৯৮৭ সালের ৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত ১৫ বছর ধরে বিতর্ক জিইয়ে রেখেছিল। কিন্তু সদস্যগণ কোন সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা দাঁড় করাতে পারেনি। সিরিয়া অভিযোগ করে যে ১৯৫৪ সালে ইসরাইল একটি সিরীয় বিমান গুলি করে ভূপাতিত করার মাধ্যমে সন্ত্রাস শুরু করে। লিবিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, নামিবিয়া এবং প্যালেস্টাইনে সন্ত্রাসবাদের মদদ দেয়ার জন্য বর্ণবাদী সরকারগুলোকে অভিযুক্ত করে। তারপর ইসরাইল কর্তৃক ইরাকের পারমাণবিক চুল্লি ও আমেরিকা কর্তৃক লিবিয়ার ত্রিপোলী বিমান হামলা ছিল অন্যতম সন্ত্রাসী কার্যক্রম। আমেরিকা কর্তৃক ইরানের উপর কমান্ডো আক্রমণটিও ছিল একই ধরনের।

নিকারাগুয়া, পোল্যান্ড এবং মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্রের উপর সংঘটিত ঘটনাও একই ইঙ্গিত বহন করে। তাই পশ্চিম ইউরোপীয় অর্থনৈতিক গোষ্ঠীর দেশ কানাডা, জাপান, তুরস্ক, আর্জেন্টিনা, ইসরাইল ও আমেরিকা সকলেই একমত যে, সন্ত্রাসবাদের সংজ্ঞা প্রদান সম্ভব নয়।

আলবেনিয়া অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণে সন্ত্রাসবাদের শুরু এবং বিস্তারের কথা উল্লেখ করেছে। সন্ত্রাসবাদের সৃষ্টি হয়েছে আমেরিকা কর্তৃক ভিয়েতনাম, ইরান, গ্রানাডা, লেবানন ও নিকারাগুয়া কিংবা ইসরাইল কর্তৃক প্যালেস্টাইন, লেবানন ও অন্যান্য আরব বিশ্বের উপর; দক্ষিণ আফ্রিকা কর্তৃক তার নিজ দেশ ও নামিবিয়ায় অথবা রাশিয়া কর্তৃক আফগানিস্তানের উপর আগ্রাসনের মধ্য দিয়ে। জাতিসংঘ অবশ্য রাষ্ট্রীয় পর্যায়সহ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নেয়া সকল সন্ত্রাসী কর্মকান্ডকে সাধারণভাবে নিন্দা করে। জাতিসংঘের এ সংক্রান্ত রেজুলেশনটি ১৫৩ ভোটের বিপুল ব্যবধানে পাস হয়েছিল। শুধুমাত্র ২টি সদস্য রাষ্ট্র ভিন্ন মত পোষণ করে কিংবা ভোটদানে বিরত থাকে।

স্বাধীনতার আগের আফগানিস্তানের চিত্র ছিল নৃশংসতা ও সন্ত্রাসবাদের অন্যতম উৎস। কোন ব্যক্তি বা আদর্শিক সংগঠন এবং কোন সরকার নির্দোষ জনসাধারণকে অত্যাচার কিংবা নির্যাতন করলে সন্ত্রাসীর জন্ম হয়। মানবতার এ কর্মকাণ্ড নিষ্ঠুর স্বার্থপরতা ও এর অপব্যবহারে জর্জরিত। সন্ত্রাসী কর্মকান্ডে জড়িতরা সভ্য সমাজের বাইরের জনগোষ্ঠী। তারা নৈরাশ্যবাদী, ক্ষিপ্ত এবং নিষ্ঠুর হয়ে থাকে। তাদের কোন আদর্শিক গাইড লাইন নেই এবং জীবনের কোন নৈতিক মূল্যবোধ তাদেরকে পরিচালনা করে না। এরা নিজেরাই নিজেদের আইন। তাদের স্বেচ্ছাচারিতার কোন সীমা থাকে না, তারা তাদের

www.pathagar.com

ইচ্ছা পূরণ কল্পে যে কোন পর্যায় পর্যন্ত যেতে পারে। তাদের বিবেক মৃত। তাদের প্রকৃতি বিদ্বেষমূলক এবং চরিত্র সন্দেহ প্রবণ। তারা নিজেদেরকে অনেক বড় মনে করে এবং তাদের কৃত লাম্পট্য উপভোগ করে। তাদের ব্যক্তিত্ব বিপথগামী এবং মানসিক অবস্থা নাশকতামূলক। অসৎ অভ্যাস এবং কর্মকাণ্ডের জন্য তারা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকে। মানুষ নামের এসব ভয়ংকর প্রাণী পৃথিবীর জন্য দুঃখজনক ও মানবতার জন্য অভিশাপ।

মৌলবাদ ও সন্ত্রাসবাদ

পশ্চিমা সংবাদ মাধ্যমগুলো সন্ত্রাসবাদের আলোকে মৌলবাদের ধুয়া তুলছে যেন এ দু'য়ের মধ্যে কোন একটি সংযোগ রয়েছে। পশ্চিমা বিশ্বে বিশেষ করে খ্রিস্টানদের ধ্যান-ধারণায় এ প্রেক্ষিতটি রচিত হয়েছে। ইউরোপে গীর্জা ও রাষ্ট্রের মধ্যে সৃষ্ট মধ্যযুগীয় সংঘাত রাষ্ট্রের পক্ষে সমাধান দিয়েছিল। এ সময় থেকে পার্থিব জীবনের ব্যাপারে ধর্মের উপর ধর্মীয় গোঁড়াদের (Orthodox) জেদ প্রভাব বিস্তার করে এবং পিউরিটানদের মতবাদকে বিদ্রুপ করে। ধর্মীয় বিচ্যুতি ও অব্যাহত বিকাশের অজুহাত দিয়ে ক্যাথলিক মতবাদের প্রশংসা করা হয়। এভাবে জাগতিক দৃষ্টিভঙ্গির উচ্চ প্রশংসার প্রেক্ষিতে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের উদ্ভব হয়। পশ্চিম ইউরোপের রোমান ক্যাথলিক চার্চ এবং পূর্ব ইউরোপের বাইজান্টাইনের অর্থোডক্স চার্চ এভাবে ব্যক্তি পর্যায়ে নির্বাসিত হয়। খ্রিস্টান ধর্মালম্বীদের মধ্যে ধর্মীয় কোনো খারাপ কিছুর কথা ভেবে অন্য ধর্মের মানুষগুলো তাদের পূর্ব ধর্ম বিশ্বাসের দিকে ফিরে যেতে চেয়েছিল। তারা খ্রিস্টীয় তত্ত্বের মৌলবাদিতার পুনরুজ্জীবনে এবং মূলতত্ত্ব পুনরুদ্ধারে আগ্রহী ছিলো এবং তাদের পুনরুত্থানবাদকে মৌলবাদ হিসেবে অভিহিত করা হয়।

ধর্ম নিরপক্ষেতাবাদীরা জ্ঞান বিজ্ঞান ইত্যাদিতে বাধাদানকারীদেরকে রোমান ক্যাথলিকের বিরুদ্ধবাদী হিসেবে দমন করার জন্য স্থাপিত বিচারালয়ে সোপর্দ করার ভয় দেখাতো এবং অতি মাত্রার পিউরিটানরা বুদ্ধিজীবীদের ওপর নির্যাতন চালাতো। এভাবে তারা ধর্মীয় ব্যক্তিদের আশা আকাঙ্খাকে নির্যাতনের মাধ্যমে দমন করতে চাইতো।

মৌলবাদের শাব্দিক অর্থ হচ্ছে চরম মতবাদ, যার অন্য নাম হচ্ছে সামগ্রিক বিদ্রোহ। সকল সামাজিক বিদ্রোহী ও সংস্কারক হচ্ছে চরম মতবাদী তারা একটি সমাজকে আবৃত ও বিভ্রান্ত করে পুরনো ও জীর্ণ ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর চেষ্টা করে। তাদেরকে ইতিহাসে প্রগতিশীল বলা হয়।

ইসলামী মৌলবাদ

ইসলামী মৌলবাদীগণ ইসলামের ইতিহাসে সব সময়ই একটি ইতিবাচক ও গঠনমূলক ভূমিকা পালন করে আসছে। ইসলামে প্রচলিত ধর্মমতের প্রতি নিষ্ঠাকে আলোকবর্তিকার ন্যায় মনে করা হয়। নৈতিক মূল্যবোধের সংরক্ষণ সর্বদাই ইসলামে চরিত্র ও আচার আচরণের পুনসংস্কারণ বলেই বিবেচিত হয়েছে। উন্নত জীবনের ধারণা এবং ধর্মীয় আচরণ ইসলামী মৌলবাদের বিশুদ্ধতার ছাপ (Holy mark) বলেই বিবেচিত। আধুনিক

www.pathagar.com

ইতিহাসে বিশ্বের ওপর পশ্চিমা বিশ্বের আধিপত্যের প্রেক্ষিতে ইসলামী মৌলবাদীগণ মুক্তি আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছেন। তারা মানুষের কাঁধ থেকে বিদেশী জোয়াল ফেলে দিতে এবং তাদের নিজেদের গৃহে দাসের পরিবর্তে প্রভু হওয়ার প্রতি গুরুত্বারোপ করার জন্য দুর্বলদেরকে অনুপ্রাণিত করেন। তারা রাজনৈতিক বিদ্রোহী এবং সমাজ সংস্কারক। কার্যত স্বাধীনতার প্রতি তাদের ভালোবাসা আল্লাহ্ ভীতির দ্বারা অনুপ্রাণিত। তারা আল্লাহর নিকটেই আত্মসমর্পণ করে যাতে তারা অন্য কোন মানুষের দাসত্ব থেকে মুক্ত হতে পারে। এভাবে তারা আল্লাহ্ ভীতির উপর গুরুত্ব দেয় এবং ন্যায়পরায়ণতা অবলম্বন করে।

ইসলাম ও সন্ত্রাস

বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে দৃঢ় আস্থা ও সুনির্দিষ্টভাবেই বলা যায়, ইসলাম ও সন্ত্রাসের মধ্যে কোন ধরনের সম্পর্ক নেই। তারা দু'টি ভিন্ন মেরু। ইসলাম আক্ষরিক অর্থে আল্লাহর নিকট পূর্ণ আত্মসমর্পণকে বুঝায়, এর অর্থ হলো শান্তি। ইসলাম আল্লাহকে ভয় করতে বলে, তাহলে কিভাবে ইসলাম একজন অপরজনকে ভয় দেখাতে বলবে? আল্লাহর প্রতি আত্মসমর্পণকারী কখনো অন্যের নিকট কাউকে আত্মসমর্পণ করতে বলে না। ভীতি প্রদর্শন ও প্রতারণা ইসলামী চেতনার পরিপন্থী।

ইসলামের অন্যতম সামাজিক মূল্যবোধ 'আসসালামু আলাইকুম' বলে একে অপরকে শুভেচ্ছা জানানো। যার অর্থ 'আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক'। প্রত্যেককে কাজ শুরু করার পূর্বে 'পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি" বলার তাগিদ দেয়া হয়েছে। কুরআনুল কারীমের প্রথম সূরা 'আল ফাতিহা'তে আল্লাহ্ দয়ালু ও ক্ষমাশীল এই প্রার্থনা করা হয়েছে। প্রতিটি কাজেই এভাবে দয়া কামনা করে প্রার্থনা করতে হয়। এসব কিছুই ইসলামী সমাজের প্রকৃতি ও চরিত্রকে নির্দেশ করে। এগুলো পরিপূর্ণ শান্তি, স্থিতি, স্নেহ-মমতা ও দয়া দাক্ষিণ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। ভালবাসা, দয়া ও মমতা বিশ্বাসীদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

ইসলামে আল্লাহর ধারণা

ইসলামে আল্লাহর ধারণাকে ব্যাপকভাবে অধ্যয়ন করা প্রয়োজন। আমরা শুধুমাত্র তার প্রধান প্রধান গুণাবলী দেখেছি। এগুলো আরোপ করা হয়েছে এমন একজনের জন্য, 'যিনি সকল কিছুর স্রষ্টা' (রাব্বুল আলামীন)। কুরআনুল কারীমের প্রথম আয়াতেই রাব্বুল আলামিন কথাটি এসেছে। 'রব' শব্দটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এর সাধারণ ও আংশিক অর্থ হলো পালন কর্তা। বিশ্লেষকগণ 'রব' শব্দটিকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন, সন্তানের প্রতি পিতামাতার যেমন ভালোবাসা রয়েছে তেমনি আল্লাহরও প্রত্যেকের প্রতি রয়েছে ভালোবাসা তবে আত্মিকভাবে আল্লাহ মানবজাতির কারো সঙ্গে সম্পর্কিত নন। ইসলামের একত্ববাদের ধারণা খ্রিস্টানদের ত্রিত্ববাদের ধারণার বিপরীত। কুরআনুল কারীমের নিম্নোক্ত আয়াতগুলো মানবতার জন্য স্বর্গীয় ভালোবাসার অমীয় বাণী বহন করে : 'আল্লাহ্ বলেন, আমি শাস্তি দেই তাকেই যাকে ইচ্ছা করি অন্যথায়

www.pathagar.com

সকল বস্তুর প্রতি আমার ভালোবাসা রয়েছে'। (৭:১৫৬) 'আল্লাহ যদি ভূ-পৃষ্ঠে মানুষের সম্পাদিত কাজের হিসাব নিতেন তাহলে কোন জীব জন্তুকে রেহাই দিতেন না। কিন্তু তিনি এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত এগুলোকে অবকাশ দিয়ে থাকেন।' (৩৫:৪৫)

ইসলামের নবী (সা)

আল্লাহ যেমন সমগ্র বিশ্বের স্রষ্টা এবং সংরক্ষক তেমনি ইসলামের সর্ব শেষ নবী মুহাম্মদ (সা) সমগ্র মানবতার জন্য দয়া ও আর্শীবাদ স্বরূপ। আল্লাহ বলেন 'আমি তোমাকে সমগ্র মানবতার জন্য আর্শীবাদস্বরূপ পাঠিয়েছি।' (২১:১০৭) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর একটি বাণী পবিত্র কুরআনুল কারীমের উক্ত আয়াতটিকে আরো শক্তিশালী করেছে - 'সকল সৃষ্টিই আল্লাহর সন্তান (সমতুল্য) সুতরাং আল্লাহ তাকেই বেশী ভালোবাসেন যে তাঁর (আল্লাহর) সৃষ্টিকে সবচেয়ে বেশী ভালোবাসে।' সুতরাং নবী (সা) কে কুরআনুল কারীমে 'দয়া ও আশীর্বাদের' মূর্ত প্রতীক হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে এবং তার নম্রতা এবং বিনয় আল্লাহর বাণী দ্বারাই সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাই মুহাম্মদ (সা)-এর শরীয়াহ সমগ্র মানবতার জন্য সর্বোৎকৃষ্ট বিধান। এটি সকল মানুষকে শ্রেণী, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সামাজিক ন্যায় বিচার নিশ্চিত করার শিক্ষা দেয়।

প্রতিদানের আইন

ইসলামের সামাজিক ন্যায় বিচারের ধারণা প্রতিদানের প্রাকৃতিক আইনের উপর প্রতিষ্ঠিত। এটি অবস্থা-অবস্থান নির্বিশেষে দোষগুণের ভিত্তিতে মানুষকে বিচার করে। এ নীতির ভিত্তি হলো ' যেমন কর্ম তেমন ফল', প্রত্যেক ব্যক্তিই তার কাজ অনুযায়ী ফলাফল ভোগ করবে। 'কেউ যদি অনু পরিমাণ সৎকর্ম করে তবে সে তার প্রতিদান লাভ করবে, আর যদি কেউ অনু পরিমাণ অসৎকর্ম করে তবে সে তার প্রতিদান লাভ করবে'। (৯৯:৭-৮)

মানুষের কর্মের কারণে ভূমিতে ও পানিতে বিশৃংখলা সৃষ্টি হয়, আল্লাহ তাদের কিছু কর্মকাণ্ডের পরিণতি আস্বাদনে বাধ্য করেন।' (৩০:৪১)

'তোমার প্রতিপালক এরূপ নহেন যে, তিনি অন্যায়ভাবে জনপদ ধ্বংস করবেন অথচ তার অধিবাসীরা পুণ্যবান'। (১১:১১৭)

'যদি আল্লাহর প্রতি তোমাদের বিশ্বাস ও কৃতজ্ঞতা বোধ থেকে থাকে তাহলে কেন আল্লাহ তোমাদেরকে দোষী সাব্যস্ত করবেন?' (৪:১৪৭)

'যদি আল্লাহ মানবজাতির এক দলকে অন্য দল দ্বারা প্রতিহত না করতেন তবে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যেতো কিন্তু আল্লাহ বিশ্বের প্রতি প্রসন্ন।' (২:২৫১)

ইসলামে অপরাধ আইন

ইসলামে অপরাধ আইন প্রতিদানের স্বাভাবিক আইনকে বিধিবদ্ধ করে। ইসলামের বস্তুগত ধারণায় বিচার অবশ্যই স্বাভাবিক নিয়মে চলবে। সেখানে বাধা থাকবে না কিংবা

www.pathagar.com

অতিরিক্ত সাংবিধানিক বিবেচনায় পরিবর্তন বা বিকৃতিকরণ করা যাবে না। আইনের দৃষ্টিতে সকল নর ও নারী সমান। যারা নিষ্ঠুরতায় মগ্ন তাদের কোন অজুহাতেই ছাড়া যাবে না। এরপর অপরাধের শাস্তির ব্যবস্থা। আমলযোগ্য ও প্রমাণিত হলে শাস্তি অনিবার্য। এভাবে সকল সম্ভাব্য দুষ্কৃতকারীর জন্য এটি হবে কঠোর হুঁশিয়ারী। সাধারণ মানুষের নৈতিকতাকে ক্ষতিগ্রস্থ করতে পারে এ ধরনের নোংরামী, এ ধরনের দুষ্কৃতিকে দূরীভূত ও আবর্জনা মুক্ত করতে হবে। এর অর্থ হলো সকল উপায়ে সমাজে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করা। কিন্তু ইসলামে সাক্ষ্য আইন অত্যন্ত কঠিন। অসমর্থিত কোন সাক্ষ্য দ্বারা কোন অপরাধীকে দোষী সাব্যস্ত করা যাবে না। কোন সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে এমন কিছুকে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে বিবেচনায় নিতে হবে। সুতরাং চূড়ান্তভাবে দোষী প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত কোন অপরাধীকে শাস্তি প্রদান করা যাবে না। অপরাধ চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত হলে তার উপর কোন ধরনের অনুগ্রহ দেখানোর সুযোগ নেই।

'আমরা তাদের জন্য বাধ্যতামূলক করেছি যে, প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ, চক্ষুর বিনিময়ে চক্ষু, নাকের বিনিময়ে নাক, কানের বিনিময়ে কান, দাঁতের বিনিময়ে দাঁত, এভাবে সকল ক্ষতির প্রতিশোধ হবে। যদি কেউ ক্ষমা করে দেয় তবে সেটি তার জন্য গ্রহণযোগ্য হবে। কিন্তু যারা আল্লাহর অনুশাসন অনুযায়ী বিচার মীমাংসা করে না তারা অত্যাচারী।' (৫:৪৫)

'হে বিশ্বাসীগণ! হত্যার ক্ষতিপূরণ হত্যা। স্বাধীন ব্যক্তির বদলে স্বাধীন ব্যক্তি, ক্রীতদাসের বদলে ক্রীতদাস, নারীর বদলে নারী তোমাদের জন্য বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। কিন্তু তার ভাইয়ের পক্ষ হতে কাউকে ক্ষমা প্রদর্শন করা হলে স্বাভাবিক ও যথাযথভবে রক্তের মূল্য নির্ধারণ ও পরিশোধ করতে হবে। এটি তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে অনুগ্রহ ও ক্ষমা। এরপরেও যদি কেউ সীমালংঘন করে তা হলে তার জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি। হে বোধসম্পন্ন ব্যক্তিগণ, হত্যার বদলে হত্যায় তোমাদের জন্য রয়েছে জীবন। যাতে তোমরা সাবধান হতে পার।' (২:১৭৮)

এভাবে ন্যায় বিচার ও ক্ষমার সমন্বয় ঘটেছে ইসলামী অপরাধ আইনে। আইন আদালতে অপরাধীগণের কোন অনুগ্রহ প্রাপ্তির সুযোগ নেই। আদালত শুধু বিধিবদ্ধ অপরাধীকে ক্ষমা করে দিতে পারে অথবা শাস্তির ভার লাঘব করে দিতে পারে। এভাবে বিচার ও সুষম পদ্ধতিতে অপরাধীর শাস্তি হয় এবং নালিশকারীর ক্ষতি তার সন্তুষ্টি মোতাবেক পুষিয়ে দেয়া হয়। আইনের দৃষ্টিতে সমতা এবং বিশ্বাসীদের মধ্যে সমঝোতার ভিত্তিতে সকল শর্তাবলী পূরণ করা হয়।

বর্তমানে পশ্চিমা বিশ্বে প্রচলিত বিচার ব্যবস্থা থেকে ইসলামী বিচার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ পৃথক। উদার নৈতিক সংস্কারের নামে পশ্চিমা বিশ্ব অপরাধীদেরকে আরো অধিক অপরাধপ্রবণ করে তুলছে। পশ্চিমা বিশ্বের কারাগার ব্যবস্থায় কারাগারগুলো স্বাস্থ্যকর ও বিলাসবহুল বাড়িতে পরিণত হয়েছে। এ ব্যবস্থা বিচারের মর্মবাণীকে ক্ষুন্ন করে এবং মানব প্রকৃতির বাস্তবতাকে অস্বীকার করে। এ কারণেই পশ্চিমা বিশ্বে অপরাধ অনবরত সংঘটিত হচ্ছে আর মুসলিম দেশ যেখানে শরীয়াহ আইন বলবত রয়েছে সেসব দেশ

www.pathagar.com

বহুলাংশে অপরাধমুক্ত রয়েছে। ইসলামে অপরাধ আইনকে ইসলামী জীবন বিধানের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে দেখতে হবে যা সমাজে পূর্ণ শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম। এটি সমাজে অপরাধীদেরকে অপরাধের উৎস হতেই চিরতরে নির্মূল করে দেয়।

যুদ্ধ ও শান্তি সম্পর্কে ইসলামী ধারণা

ইসলামে যুদ্ধ ও শান্তির ধারণা জীবনের প্রতি সম্মানের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। যখন আদমের সন্তান কাবিল প্রথম খুন করে তার ভাই হাবিলকে সে সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে : 'এ কারণেই বনী ইসরাঈলের প্রতি এ বিধান দিলাম যে, নর হত্যা অথবা দুনিয়াতে ধ্বংসাত্মক কার্য করা ব্যতীত কেউ কাউকে হত্যা করলে সে যেন দুনিয়ার সকল মানুষকে হত্যা করল। আর কেউ কারো প্রাণ রক্ষা করলে, সে যেন দুনিয়ার সকল প্রাণ রক্ষা করল।' (৫:৩২)

দাঙ্গা ইসলামের চেতনার পরিপন্থী

'অন্য বিশ্বে আমরা ঐ গৃহ নির্মাণ করছি তাদের জন্য যারা ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেনি, না তারা বিশৃংখলা সৃষ্টির ইচ্ছা পোষণ করে এবং সেই নেককার লোকদের জন্যই পরম মঙ্গল নিহিত।' (২৮:৮৩)

ইসলামী জীবনের ধারণা এ ইঙ্গিত দেয় যে, পৃথিবীকে আল্লাহর ইচ্ছায় মানুষের জন্য অনুকূল করে গড়ে তোলা হয়েছে, আল্লাহ্ তার নবীগণকে প্রেরণ করেছেন পৃথিবীর উন্নয়ন ঘটানোর জন্য : 'পৃথিবীতে শান্তি স্থাপনের পর তোমরা এতে বিপর্যয় ঘটিও না। আল্লাহকে ভয় ও আশার সাথে ডাকবে।' (৭:৫৬)

'এটি এ পৃথিবীতে জীবনের ভারসাম্যের পরামর্শ দেয় যাকে কখনোই বিরক্ত করা যাবে না। সুতরাং নিষ্ঠুরতার দ্বারা যারা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে তাদেরকে তাদের মতো করেই প্রতিদান দেয়া হবে এবং কঠোর শাস্তি প্রদান করা হবে' : 'যদি তোমরা প্রতিশোধ নিতে চাও তবে ঠিক ততখানি নিবে যতখানি অন্যায় তোমাদের প্রতি করা হয়েছে। তবে তোমরা ধৈর্য ধারণ করলে ধৈর্যশীলদের জন্য এটিইতো উত্তম'। (১৬:১২৬) 'যদি কেউ তোমার বিরুদ্ধে সীমালংঘন করে, তুমিও তার বিরুদ্ধে লংঘন করতে পারো যতটুকু পর্যন্ত সে করেছে। কিন্তু আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রাখ যে, আল্লাহ্ অবশ্যই মুত্তাকীদের সঙ্গে আছেন'। (২:১৯৪)

সকল প্রকার উস্কানি ও আগ্রাসনের জবাবে সংযম ও ধৈর্য ধারণ করতে হবে। এ প্রেক্ষিতে মুসলমানগণকে তাদের প্রতিপক্ষ ও শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য অনুমতি দেয়া হয়েছে।

'যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হলো তাদেরকে যারা আক্রান্ত হয়েছে; কারণ তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে, আল্লাহ্ নিশ্চয় তাদেরকে সাহায্য করতে সম্যক সক্ষম।' (২২:৩৯-৪০)

কিন্তু 'জিহাদের' জন্য এ অনুমোদন কতিপয় শর্তসাপেক্ষ : 'যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, তোমারাও আল্লাহর পথে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর। কিন্তু সীমালংঘন করো না, নিশ্চয় আল্লাহ্ সীমালংঘনকারিদেরকে ভালোবাসেন না।' (২:১৯০)

www.pathagar.com

আত্মরক্ষার জন্য যুদ্ধ করার জন্য অনুমতি থাকা সত্ত্বেও শান্তির জন্য সদা প্রস্তুত থাকা প্রয়োজন - যদি তুমি কোন সম্প্রদায়ের বিশ্বাস ভংগের আশংকা কর তবে তোমার চুক্তিও তুমি যথাযথ বাতিল করবে; আল্লাহ্ বিশ্বাস ভংগকারীদেরকে পসন্দ করেন না। (৮:৫৮)

যুদ্ধ ও শান্তির এ শর্তাবলী নিশ্চয়ই চমৎকার, অত্যন্ত যুক্তিসম্মত এবং অতি সাবলিল। ধৈর্য, অকপটতা, সমতা ও শর্তাবলীর সাথে সম্পর্কিত। ইসলামে যুদ্ধ সত্যিকারার্থেই যে কোন রকম ছলচাতুরী ও কপটতা মুক্ত এবং শান্তির অর্থবোধক, এটি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বর্তমান বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। আল্লাহর সৈন্যগণ মিশনারী স্বরূপ, তারা ভাড়াটে সৈন্য নয়।

ইসলামে সহিষ্ণুতা

আইনের একটি স্বাভাবিক পথ রয়েছে তা সত্ত্বেও তার বাইরে ইসলাম তার অনুসারীগণকে সকল সময় অধিকতর সহিষ্ণুতা ও ধৈর্যধারণ করার নির্দেশ প্রদান করে। অন্যান্যদের সাথে আচরণের বেলায়ও একই রকম নির্দেশ প্রদান করে। 'ধর্মীয় বিভিন্নতা সহ্য করতে হবে এবং অন্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে হবে। ধর্মে কোন বল প্রয়োগের ব্যবস্থা নেই'। (২:১০৮)

'আল্লাহ্ ছাড়া অন্যকে যারা ডাকে তাদেরকে তোমরা গালি দিও না' (৬:১০৮)। সকল ধর্মাবলম্বী কর্তৃক একটি অভিন্ন ব্যবস্থা নিতে হবে : 'কিতাবীদের তুমি বল আমাদের মধ্যে যা অভিন্ন সে বিষয়ে তোমরা এসো যেন আমরা আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো ইবাদত না করি, কোন কিছুকেই তার শরিক না করি এবং আমাদের কাউকে কেউ আল্লাহ্ ছাড়া রব হিসেবে গ্রহণ না করে। (৩:৬৪)

মতপার্থক্য এমনকি দ্বন্দ্ব সংঘাত থাকা সত্ত্বেও অন্যের সাথে সহযোগিতাকে উৎসাহিত করা হয়েছে ; '(সেই সব) লোকের প্রতি তোমাদের ক্রোধ, যারা পবিত্র মসজিদে যাওয়াকে বাধা দেয় তোমাদেরকে যেন কখনই সীমালংঘনে প্ররোচিত না করে, পূণ্যবান ও আল্লাহ্ ভক্তদের সঙ্গে তোমরা সহযোগিতা কর গুনাহ্গার ও দুষ্টের সঙ্গে সহযোগিতা করো না।' (৫:২)

বুদ্ধিমত্তা ও যৌক্তিকতার মাধ্যমে আল্লাহর পথে প্রচার করতে হবে

'মানুষকে তোমার রবের প্রতি আহ্বান কর বুদ্ধিমত্তা ও যৌক্তিকতার সাথে এবং তাদের সাথে যুক্তি তর্কের অবতারণা কর সর্বোত্তম পন্থায়। অত্যন্ত নম্রভাবে আত্মপক্ষ সমর্থন করা যায়' - 'ভালো ও মন্দ সমান হতে পারে না। মন্দকে প্রতিহত কর উৎকৃষ্ট দ্বারা, ফলে তোমাদের সাথে যার শত্রুতা আছে সে হয়ে যাবে অন্তরঙ্গ বন্ধু।' (৪১:৩৪)

ইসলামে সহিষ্ণুতার সীমারেখার আরেকটি নমুনা হল, আল্লাহর প্রেরিত সকল নবী ও রাসূলের উপর বিশ্বাস রাখা : 'তারা নবী ও নবীদের মধ্যে পার্থক্য রচনা করে না, এ ঘোষণার সাথে সকল বিশ্বাসীগণ আল্লাহ্, তার ফেরেশতা আর সকল কিতাব এবং তার সকল নবীর ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে।' (২:২৮৫)

www.pathagar.com

এটি হচ্ছে আল্লাহর একত্ববাদের সেই নীতি যার উপর ভিত্তি করে সকল ধরনের মর্যাদা নিরূপণ করা হয়। আল্লাহ্ বলেন 'হে মানুষ, আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি একটি মাত্র পুরুষ ও একটি মাত্র নারী হতে এবং তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বহু জাতি ও গোত্রে যাতে তোমরা পরস্পরকে চিনতে ও বুঝতে পার। নিঃসন্দেহে আল্লাহর দৃষ্টিতে তোমাদের মধ্যে সেই উত্তম যে পূণ্যবান।' (৪৯:১৩)

ইসলামে সন্ত্রাবাদের ধারণা

উপরিউক্ত ঘটনার প্রেক্ষাপটে বলা যায় যে, ইসলাম সমাজ থেকে সন্ত্রাসকে উৎখাত করতে এবং সকল ভয় ও অন্তর্ঘাতমূলক কর্মকাণ্ড থেকে সমাজকে মুক্ত রাখতে চায়। আর এ কারণে কুরআন বিশ্বাসীদের অত্যন্ত শান্তিপ্রিয় করার ঘোষণা দিয়েছে যা সকল রকম সহিংসতা থেকে অবিমিশ্রভাবে সমুন্নত ও লালন করতে হবে। পূর্ণ বিশ্বাস অর্থ হচ্ছে পূর্ণ শান্তি : তোমরা যাকে আল্লাহর শরীক কর আমি তাকে কিভাবে ভয় করব? অথচ তোমরা আল্লাহর শরীক করতে ভয় কর না যে বিষয়ে তিনি তোমাদেরকে কোন সনদ দেননি; সুতরাং যদি তোমরা জান তবে বল দু'দলের মধ্যে কোন দল নিরাপত্তা লাভের অধিকারী? যারা আল্লাহতে বিশ্বাস রাখে এবং সহিংসতার সাথে তাদের বিশ্বাসকে মিশ্রিত করে ফেলেন না শুধু তারাই শান্তির হকদার এবং তারাই সঠিক পথে।' (৬: ৮১,৮২)

কুরআনে বিশৃঙ্খলাকে খুনের চেয়েও জঘন্য বলা হয়েছে

'ফিতনা হত্যা অপেক্ষাও গুরুতর অন্যায়'। (২:২১৭)। সুতরাং একবার যদি প্রমাণিত হয় যে সন্ত্রাসীরা প্রকৃতপক্ষেই ব্যক্তিগত লাভের ও স্বার্থের জন্য নির্দোষ ব্যক্তিদের সন্ত্রস্ত করে তাহলে ইসলামী আইনের আওতায় তাদেরকে কঠোরভাবে মোকাবেলা করতে হবে। তারা ক্ষতিকর রোগ জীবানুর ন্যায় যা থেকে সমাজকে মুক্ত করতে হবে। মানবতার শত্রু ও স্বার্থপরকে কখনো সহ্য করা যাবে না। তারা মানব শরীরের ক্যান্সারের সমতুল্য এবং তাদের থেকে সতর্ক থাকতে হবে।

www.pathagar.com

সন্ত্রাস, সন্ত্রাসবাদ
এর মোকাবেলায় আন্তর্জাতিক প্রয়াস *

অনুবাদ : এম রুহুল আমিন

সন্ত্রাসবাদের মূল ও এর কারণ

সন্ত্রাস আর সন্ত্রাসবাদের উপর অনেক আলোচনা ও লেখালেখি হয়েছে। সন্ত্রাসবাদের উৎপত্তির কারণ সম্পর্কে যত কিছুই আমরা বলি না কেন এর কারণে যে অসংখ্য নিরপরাধ মানুষ প্রাণ হারাচ্ছে তাতে কোন দ্বিমত নেই। পৃথিবীর সর্বত্রই সন্ত্রাসের ঘটনা ঘটছে। বিভিন্ন দেশের মানুষের কাছে সন্ত্রাস বিভিন্ন অভিধায় অভিহিত। যে যার মত করে এর নাম উচ্চারণ করে। সন্ত্রাসকে আমরা যে যেভাবেই দেখি না কেন যারা সন্ত্রাস করে তারা তাদের কার্যক্রম চালিয়েই যাচ্ছে।

সন্ত্রাসবাদকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হচ্ছে এবং বিভিন্ন কর্মকান্ডকে সন্ত্রাসবাদের সাথে জুড়িয়ে দেয়া হচ্ছে। এসব কারণে সন্ত্রাসবাদের আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত নাম পাওয়া যায় না। একেকজন সন্ত্রাসকে একেকভাবে সংজ্ঞায়িত করার কারণে আন্তর্জাতিক সহায়তা ছাড়া এককভাবে সন্ত্রাসবাদের গ্রহণযোগ্য কোন সংজ্ঞা প্রদান কষ্টকর এবং জটিলও বটে। একইভাবে আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টা ছাড়া সন্ত্রাসবাদের সাথে পেরে উঠাও সহজ নয়। সেজন্য সন্ত্রাস নির্মূলের জন্য সর্বপ্রথমে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে সন্ত্রাবাদের গ্রহণযোগ্য একটি সংজ্ঞা বের করতে হবে। সংজ্ঞা নির্ধারণে সবাইকে একমত হতে হবে। সন্ত্রাসবাদ কী প্রথমে তাই নির্ধারণ করতে হবে। বিশ্ব মানব সভ্যতার নিকট জাতিসংঘই একমাত্র সংস্থা সবার কাছে যা গ্রহণীয় হতে পারে। জাতিসংঘই পারে গ্রহণযোগ্য একটি সংজ্ঞা নির্ণয় করতে। সন্ত্রাসের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের অধিকার যাতে রক্ষিত হয় এমন ব্যাপক একটি সংজ্ঞা জাতিসংঘ নিরূপণ করতে পারে।

মানব সভ্যতার ইতিহাসে সন্ত্রাসবাদের যে পরিচয় পাওয়া যায় তা মানব সভ্যতার ইতিহাসের ন্যায় একই রকম দীর্ঘ। এ দীর্ঘ ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, গ্রীক ঐতিহাসিক জেনোফোন খ্রিস্ট-পূর্ব ৪৩১-৩৫০ -এ শত্রুদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী তৎপরতা চালানোর কথা বলেছেন এবং তিনি তার নিজের উপর মানসিক যুদ্ধের প্রতিক্রিয়ার কথাও বলেছেন। প্রথম শতাব্দীতে রোমের রাজা তহবিল তছরূপ করলে তিনি তার বিরোধিতাকারীদেরকে দমন করার নিমিত্ত মৃত্যুদন্ড দিয়েছিলেন। যারা বেঁচে ছিল তাদেরকে তিনি সন্ত্রাসের মাধ্যমে ভয় প্রদর্শন করেছিলেন। উনিশ শতকের

www.pathagar.com

দ্বিতীয়ার্ধে পশ্চিম ইউরোপ, রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কনফুসীয় অনুসারীগণ তাদের সমাজে রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তন আনার জন্য সন্ত্রাসবাদের পথ বেছে নিয়েছিল। সন্ত্রাসবাদের অংশ হিসেবে তারা তাদের দেশের অনেক উর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে হত্যাও করেছিল।

সমসাময়িক ইতিহাসে ১৯৩৭ সালে প্রথমবারের মত সন্ত্রাসবাদকে দমন করা গিয়েছিল যখন লীগ অব নেশনস (League of Nations) সন্ত্রাসবাদের দমনে একটি আইন প্রণয়নের বিষয় আলোচনা করে এবং সন্ত্রাসী কার্যকলাপের জন্য শাস্তি প্রদানের কথা চিন্তা করে। জাতিসংঘ ও অন্যান্য সরকারী সংগঠনগুলো বিভিন্ন রাষ্ট্রের সংবিধান ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে সন্ত্রাসবাদের ব্যাপারে কৌতুহল প্রদর্শন করে। ১৯৬৩ সালে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ ও এর বিপদ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য ১২টি বিধিগত পন্থা অনুমোদন করে। ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনার পর ২৮ সেপ্টেম্বর ২০০১ এ নিরাপত্তা পরিষদের ১৩৩৭ নং রেজুল্যশন বলে একটি সন্ত্রাসবাদ বিরোধী কমিটি গঠিত হয়। এ রেজুল্যশন বলে নিম্নোক্ত ১২ দফা পন্থা জাতিসংঘের সদস্যদের সামনে অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হয়। আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদকে মোকাবেলা করার জন্য বিশ্ব সভার সবাইকে ১২ দফা কর্মপন্থা অনুমোদন ও স্বাক্ষরের জন্য আহ্বান জানানো হয় :

১. ১৯৭৩ সালের ১৪ ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ কর্তৃক গৃহীত কনভেনশনে কূটনীতিকদের ন্যায় ব্যক্তিদেরকে আন্তর্জাতিকভাবে প্রদত্ত নিরাপত্তার বিপরীতে কৃত অপরাধ প্রতিরোধে শাস্তির বিধান।

২. ১৯৭৯ সালের ১৭ ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে গৃহীত আন্তর্জাতিক কনভেনশনের ভিত্তিতে কাউকে জিম্মি করার বিরুদ্ধে গৃহীত সিদ্ধান্ত।

৩. ১৯৯৭ সালের ১৫ ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে আন্তর্জাতিক কনভেনশনে গৃহীত সন্ত্রাসী বোমাবাজদের দমনের লক্ষ্যে গৃহীত সিদ্ধান্ত।

৪. ১৯৯৯ সালের ৯ ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের আন্তর্জাতিক কনভেনশনে সন্ত্রাসবাদের পক্ষে অর্থায়নের বিরুদ্ধে গৃহীত সিদ্ধান্ত।

৫. বিমানের ভিতরে সংগঠিত কোন অপরাধের বিরুদ্ধে ১৯৬৩ সালের ১৪ সেপ্টেম্বরে টোকিওতে গৃহীত সিদ্ধান্ত।

৬. ১৯৭০ সালের ১৬ ডিসেম্বর হেগে (Heague) স্বাক্ষরিত অবৈধভাবে বিমান ছিনতাইয় রোধকল্পে আন্তর্জাতিক কনভেনশনে গৃহীত সিদ্ধান্ত।

৭. ১৯৭১ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর মন্ট্রিলে স্বাক্ষরিত কনভেনশন অনুযায়ী বেসামরিক বিমান চলাচলের নিরাপত্তার বিরুদ্ধে পরিচালিত অবৈধ কার্যাবলী দমনের লক্ষ্যে গৃহীত সিদ্ধান্ত।

www.pathagar.com

৮. ১৯৮৮ সালের ৩ মার্চ ভিয়েনায় স্বাক্ষরিত নিউক্লিয়ার সামগ্রী রক্ষা ব্যবস্থার উপর কনভেনশনে গৃহীত সিদ্ধান্ত।

৯. আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে বেসামরিক বিমান উঠানামার ব্যাপারে অবৈধ সন্ত্রাসী কর্মকান্ড দমনের লক্ষ্যে ১৯৮৮ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারী গৃহীত প্রটোকল।

১০. নিরাপদ নৌ পরিবহনের জন্য গৃহীত আইনের বিরুদ্ধে পরিচালিত অবৈধ তৎপরতা দমনের লক্ষ্যে ১৯৮৮ সালের ১০ মার্চ রোমে গৃহীত কনভেনশন।

১১. কন্টিনেন্টাল শেলফে (Continental Shelf) অবস্থিত স্থায়ী প্লাটফরমে এর নিরাপত্তার বিরুদ্ধে পরিচালিত কোন অবৈধ তৎপরতার বিরুদ্ধে ১৯৮৮ সালের ১০ মার্চ রোমে স্বাক্ষরিত প্রটোকল অনুযায়ী গৃহীত ব্যবস্থা।

১২. ডিটেকশনের (Detection) লক্ষ্যে প্লাস্টিক বিস্ফোরক চিহ্নিতকরণে ১৯৯১ সালের ১ মার্চ মন্ট্রিলে স্বাক্ষরিত কনভেনশনে গৃহীত ব্যবস্থা।

ইসলামী বিশ্ব ও সন্ত্রাসবাদ

সন্ত্রাসের কারণে ইসলামী বিশ্ব অনেক ইসলামী দেশের সাথে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ইসলামী দেশগুলোতে অনেক সন্ত্রাসী তৎপরতা পরিচালিত হয়েছে। জাতিসংঘের কাঠামোর মধ্যে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সমন্বিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে আদিতেই সন্ত্রাসবাদের মূলোৎপাটন করতে না পারলে এজাতীয় অনেক ঘটনাই ঘটতে থাকবে। আদর্শগত ও বস্তুগত কারণে সংগঠিত সন্ত্রাসবাদের মোকাবেলা করার সাথে সাথে সরকারীভাবে ও জনগণের মাধ্যমে সমষ্টিগতভাবে পুরো মানব জাতিকেই এর মোকাবেলায় এগিয়ে আসতে হবে। এর কারণ সন্ত্রাসী আদর্শের মাধ্যমে কোন ভেদ বিচার না করেই ভয় ভীতি ও মানুষ হত্যা করা হয়। সন্ত্রাসবাদ সামরিক বা বেসামরিক লক্ষ্য বস্তুর কোন ধার ধারে না। কোন ধর্ম, আইন বা নীতি আদর্শের ধার ধারে না।

সন্ত্রাসবাদ মোকাবেলায় আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের অংশ হিসেবে ও আই সি (O I C) ভূমিকা রাখতে পারে। ১৯৮৭ সালে এ উদ্দেশ্যে ও আই সি সরকারী ও বেসরকারী বিভিন্ন সংস্থার সাথে যোগ দেয়। এ সংস্থাগুলোর মধ্যে প্রধান ছিল জাতিসংঘ। ও আই সি সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে জাতিসংঘের জেনেভা সম্মেলনে যোগদান করে। এ সম্মেলনেই সন্ত্রাসবাদের উপর জেনেভা ঘোষণা প্রণীত হয়। এ ঘোষণাতেই সন্ত্রাসবাদী কর্মকান্ড এবং জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন ও বিদেশী দখলদারের বিরুদ্ধে পরিচালিত কর্মকান্ডকে আলাদা করে সংজ্ঞায়িত করা হয়। এ সময় হতে ও আই সি সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে তার অবস্থানকে শক্তিশালী করে। শুধু তাই নয় ও আই সি সে সময় হতে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থা বিশেষ করে জাতিসংঘের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সর্বাত্মকভাবে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের প্রতিরোধ ও নির্মূলে কাজ করে আসছে।

১৯৯৪ সালের ডিসেম্বরে সন্ত্রাসবাদ দমনে ও আই সি আচরণ বিধি প্রণয়ন করে।

www.pathagar.com

১৯৯০ -এর দশকে ইসলামী বিশ্বে কতগুলো চরমপন্থি আন্দোলন মাথা চাড়া দিয়ে উঠে। এগুলোর কোন কোনটি ইসলামের নামে তাদের কর্মকান্ড পরিচালনা করে। এসব চরমপন্থি আন্দোলনের ফলে অনেক জান ও মালের ক্ষতি সাধিত হয়। এ সকল আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদী কর্মকান্ড দমনের লক্ষ্যে ১৯৯৯ সালের জুলাইতে ও আই সি ব্যাপক ভিত্তিক কনভেনশন প্রণয়ন করে। ও আই সি'র এ কনভেনশনে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ দমনের মূলনীতি প্রণীত হয় এবং কিভাবে সন্ত্রাসবাদকে মোকাবেলা করা হবে সে পন্থা গ্রহণ করা হয়। ও আই সি'র প্রয়োজনীয় সংখ্যক সদস্যের অনুমোদনের পর ২০০২ সালের নভেম্বর হতে এ কনভেনশন কার্যকর হয়েছে।

২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের বিয়োগাত্মক ঘটনায় অমূল্য সম্পদ ও নিরপরাধ গণমানুষের হত্যার বিষয়টিকে ও আই সি জোরালোভাবে নিন্দা করে। ইসলাম মানুষ হত্যা ও মানব মর্যাদার লংঘনের বিষয়টিকে তীব্রভাবে ঘৃণা করে। মুসলমানদেরকে পশ্চিমা সভ্যতার শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করার প্রচার প্রপাগান্ডার বিষয়টিকে তীব্রভাবে প্রত্যাখ্যান করা হয়। মুসলমানরা পশ্চিমা সভ্যতাকে ধ্বংস করে দিচ্ছে পশ্চিমাদের এ প্রচারকে প্রত্যাখ্যান করা হয়। এসব কর্মকান্ডের ফলে কিছু কিছু অমুসলিম চরমপন্থি মুসলমানদের উপর পশ্চিমা দেশগুলোতে ইসলামী সেন্টারের উপর এমনকি সাংস্কৃতিক ভবনসমূহ ও মসজিদসমূহের উপর আক্রমণ করে। চরমপন্থি কর্মকান্ডের মাধ্যমে এগুলো ধ্বংস করছে। ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনা আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বিশেষ করে মুসলিম বিশ্বে নতুন বাস্তবতার জন্ম দিয়েছে। এ ঘটনায় জনগণের মধ্যে বিশেষ করে পশ্চিমা বিশ্বে ইসলামের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন হয়েছে। ইসলাম ও সন্ত্রাসবাদের মধ্যে উদ্দেশ্যহীন সম্পর্ক টেনে আনার কারণেই এরূপ অবস্থা হয়েছে। ইসলামী বিশ্বের বিরুদ্ধে এ ঘটনার পর সরাসরি আক্রমণ করা হয়েছে। এর ফলে কোন কোন মুসলিম দেশ দখল করে নেয়া হয়েছে আর এসব দেশগুলোতে নতুন অবস্থার সৃষ্টি করা হয়েছে। যার পরিণাম অনুমান করা কঠিন। ইসলামী বিশ্বের উপর যে নতুন ব্যবস্থা চাপিয়ে দেয়া হয়েছে, তা বিদেশীদের অধীনে মুসলমানদের অবস্থাকে খারাপ করে দিচ্ছে। তাদের অবস্থা কাশ্মীর ও ফিলিস্তিনের জনগণের ন্যায় রূপ নিয়েছে।

সেজন্য ইসলামের এবং ইসলামী সম্মেলনে সংস্থার দাবি যে, জাতিসংঘের উদ্যোগে আজ একটি সম্মেলন আহ্বান করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। এজাতীয় সম্মেলনে সন্ত্রাসবাদ নিয়ে আলোচনা করা হবে। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের অনুমোদিত সন্ত্রাবাদের সংজ্ঞা নিয়ে আলোচনা করা হবে। এ সম্মেলনে সন্ত্রাসবাদ আর জনগণের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ এবং বিদেশী দখল দারিত্বের অবসানের বিষয়ে আলোচনা করা হবে। এ সম্মেলনে সকল ধরনের সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে সামষ্টিক সংগ্রামের পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হবে। রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসবাদও এর আওতায় আসবে। সব ধরনের সন্ত্রাসবাদ দমনে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়সহ ব্যক্তি, সরকার ও সরকারের বাইরের সবাইকে এক যোগে এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে।

www.pathagar.com

সন্ত্রাসবাদের আলোচনা করতে গেলে মানুষ কেন সন্ত্রাস করে তার কারণের কথাও আলোচনা করতে হবে। সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের জন্য কোন যৌক্তিক কারণ খুঁজে পাওয়া না গেলেও এর অন্যবিধ কারণ থাকতে পারে। যেমন, বিদেশী দখলদারিত্ব, জনগণের বৈধ অধিকার হরণ, উন্নয়নের অভাব, ধর্মীয় শিক্ষার অভাব। এগুলোর কারণে একে অপরের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী কর্মকান্ড চালাতে পারে। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় যদি সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সত্যিকার অর্থেই যুদ্ধ চালাতে চায় আর মানব সমাজকে সন্ত্রাসবাদের দুষ্ট চক্র থেকে বাঁচাতে চায় তাহলে ধর্ম, ভৌগলিক অঞ্চল বা নীতি আদর্শ নির্বিশেষে সমগ্র মানবজাতির বিরুদ্ধে হুমকি সৃষ্টিকারী সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। অনেক চিন্তাবিদের মতে সন্ত্রাসবাদকে কার্যকরভাবে প্রতিহত করতে হলে এর উদ্দেশ্য জানতে হবে, আর ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সন্ত্রাসবাদকে নির্মূল করতে হবে।

সংগঠিত সন্ত্রাস ও সন্ত্রাসবাদ (Organised crime and Terrorism) ব্যাপক ভিত্তিক কার্যক্রম গ্রহণ

এখানে ব্যাপকভিত্তিক দৃষ্টিকোণ থেকে সংগঠিত সন্ত্রাস ও সন্ত্রাসবাদের তুলনা করা হবে। সন্ত্রাসবাদের সংজ্ঞা, সন্ত্রাসবাদের সাথে সংগটিত সন্ত্রাসের তুলনা এবং সংগঠিত সন্ত্রাসের গতিধারা ও ন্যায় বিচার -এর ব্যাপারে এখানে আলোচনা করা হবে। কোন কোন সন্ত্রাসের মোকাবেলায় আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিশেষ করে ইউরোপীয় পর্যায়ে গৃহীত পন্থা সম্পর্কে আলোচনা হবে। এরপর সন্ত্রাস বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটের উপর একটি বিস্ফোরণ সম উপসংহার টানা হবে। এর সাথে সন্ত্রাস মোকাবেলার প্রতিফলকে পরিহার করা হবে।

এক. সন্ত্রাসবাদের সংজ্ঞার সমস্যা

নিম্নবর্ণিত দু'টি প্রধান কারণের বিভিন্নতার জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় সন্ত্রাসবাদের একটি সর্বসম্মত সংজ্ঞা প্রণয়নে সক্ষম হয়নি :

ক. বেসামরিক লোকজনের প্রাণহানি সত্ত্বেও জনগণের বিদেশী দখলদারিত্বের প্রতিরোধ সংগ্রামকে কি সন্ত্রাসবাদ নামে অবহিত করা হবে?

খ. রাষ্ট্রের মাধ্যমে দেশের বেসামরিক লোকজনের বিরুদ্ধে পরিচালিত সামরিক শক্তির ব্যবহারকে যাকে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসবাদ বলা হয়ে থাকে তাকে কি সন্ত্রাসবাদ নামে অভিহিত করা যাবে?

আন্তর্জাতিক আইনে দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা সব রাষ্টেরই অধিকার আছে। রাষ্ট্র তার নিজের ভূ-খন্ডের মধ্যে সৈন্যবাহিনী পরিচালনা করার অধিকার রাখে। আন্তর্জাতিক আইনে সকল পক্ষেরই নির্দোষের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা উচিত। সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের যে কোন সংজ্ঞাতেই হোক বেসামরিক লোকদের ক্ষতি করার শর্তের উপর আলোকপাত করা উচিত।

উপর্যুক্ত সমস্যাটিকে ও আই সি কনভেনশনে সন্ত্রাসবাদ মোকাবেলার মাধ্যমে সমাধানের চেষ্টা করা হয়েছে। মানুষকে যে কোন কারণে ভীতি প্রদর্শনের লক্ষ্যে

www.pathagar.com

প্রদর্শিত সন্ত্রাসকে সন্ত্রাসবাদের সাথে সংযুক্ত করার মাধ্যমে সমস্যাটির সমাধানের চেষ্টা করা হয়েছে। সে যাই হোক দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে পরিচালিত সমস্ত সংগ্রামকে সন্ত্রাসী কর্মকান্ড বলা হয়নি।

প্রতিরোধের লড়াইয়ে বেসামরিক ও নিরপরাধীদেরকে লক্ষ্যবস্তু করা যাবে না। আমাদের এটি বিশ্বাস করতে হবে যে, একজনের ভার যেন অপরজনকে বইতে না হয়।

সংগঠিত অপরাধের সংজ্ঞা বের করা অপেক্ষাকৃত সহজ। কোন সন্ত্রাসী গ্রুপকে দোষারোপ করার শর্তে ২০০০ সালে জাতিসংঘ আন্তদেশীয় সংগঠিত অপরাধ দমনে চুক্তিতে উপনীত হয়। এ চুক্তিতে সংগঠিত অপরাধ বলতে "কোন মারাত্মক অপরাধ সংগঠনের জন্য এক বা একাধিক ব্যক্তির সাথে কোন আর্থিক বা বস্তুগত লাভালাভের জন্য কৃত চুক্তি" কে বুঝায়। এ ধরনের অপরাধ সংগঠনের ক্ষেত্রে সংগঠিত কোন সন্ত্রাসী দলের হয়ে কোন ব্যক্তি সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে পারে। কোন সন্ত্রাসী দলের লক্ষ্য অর্জনে, ব্যক্তি সন্ত্রাসী কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করতে পারে।

জাতিসংঘ চুক্তির আলোকে সংগঠিত অপরাধের বেলায় নিম্নবর্ণিত বৈশিষ্ট্যগুলো পাওয়া যায় :

১. সংগঠিত অপরাধ হয় মারাত্মক ধরনের, অনেক ক্ষেত্রে এ ধরনের অপরাধের মাধ্যমে অপরাধী তার লক্ষ্যবস্তুতে পৌঁছাতে চেষ্টা করে। মারাত্মক বলতে অন্যূন চার বৎসরের জন্য তার স্বাধীনতা হরনের ন্যায় শাস্তি হতে পারে।

২. এ ধরনের অপরাধগুলো একাকী হয় না, এ ধরনের অপরাধ সংগঠিত অপরাধী চক্রের মাধ্যমে হয়ে থাকে। এসব অপরাধী দলের সাংগঠনিক কাঠামো থাকে। এ ধরনের অপরাধী চক্রের একটি ধারাবাহিকতা থাকে।

৩. সংগটিত অপরাধের পেছনে আর্থিক স্বার্থ বা অন্য কোন বস্তুগত স্বার্থ থাকে। সংগঠিত অপরাধ বিচার-বিবেচনার ভিত্তিতে সংগটিত হয়। তহবিল সংগ্রহের উদ্দেশ্যে এ ধরনের অপরাধ ঘটানো হয়। লাভ-লোকসানও এ ধরনের অপরাধ সংগঠনের পেছনে কাজ করে থাকে।

৪. সংগঠিত অপরাধ অনেক সময় কম-বেশি হয়ে থাকে। রাষ্ট্রীয় সীমানা অতিক্রমণে এর সীমাবদ্ধতা আছে। বহু রাষ্ট্রে তার লোক নিয়োগ করার ব্যাপারেও সীমাবদ্ধতা আছে। আঞ্চলিক বা মহাদেশীয় বা বিশ্বব্যাপী এর ক্রিমিনাল ওয়েব সাইট তৈরির ক্ষমতাতেও উঠানামা বা সীমাবদ্ধতা আছে।

অনেকগুলো সবচেয়ে জন পরিচিত সংগঠিত অপরাধ তালিকার মধ্যে এই অতি সাধারণ সংজ্ঞাটি বেশি গ্রহণীয় হয়েছে। সে হিসেবে নিম্নবর্ণিত অপরাধগুলোতে উপর্যুক্ত অপরাধগুলোর উপিস্থিতি পাওয়া যায়। যেমন, মাদক চোরাচালান, অস্ত্র চোরাচালান, মানুষ অপহরণ, যানবাহন চুরি, দুর্নীতি ও ঘুষ, মানি লন্ডারিং, ছল-চাতুরী, প্রডাক্ট পাইরেসী, ট্রেড মার্ক চুরি, মেধা স্বত্ব চুরি, সাইবার স্পেস সম্পর্কিত কম্পিউটারে কৃত

www.pathagar.com

চুরির ঘটনা যেমন, ব্যাংক হিসাব জালিয়াতি, ক্রেডিট কার্ড জালিয়াতি, কম্পিউটার সফট ওয়ারের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তিগত উন্নয়নের কারণে সৃষ্ট বিভিন্ন রকমের চুরির ঘটনা।

দুই. সন্ত্রাসী অপরাধ আর সংগঠিত অপরাধের মধ্যে সম্পর্ক (Terrorist crime and organised crime)

সন্ত্রাসী অপরাধের সাথে অনেক ক্ষেত্রে সংগঠিত অপরাধের মিল দেখা যায়। নিম্নভাবে সেগুলোকে সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হলো :

১. উভয় ধরনের অপরাধেই বড় ধরনের ঝুঁকি আছে। অপরাধ সংগঠনকারীগণ কোনভাবেই তাদের লক্ষ্য অর্জনে নিরাপরাধীদের ক্ষতির কথা চিন্তা করে না।

২. উভয় ধরনের অপরাধই সংগঠিত হয় সুসংগঠিত অপরাধী চক্রের মাধ্যমে। এ চক্রের অনুমতিক্রমেই তারা অস্ত্র সংগ্রহ ও অস্ত্র ব্যবহারে অনুমতি পেয়ে থাকে। তারা যেন আন্ডার গ্রাউন্ডে তৎপর ও গোপনে কর্মরত ক্ষুদ্রতম রাষ্ট্রের ন্যায় কাজ করে। তারা তাদের লক্ষ্য বস্তুতে হানা দেয়ার জন্য সুযোগের অপেক্ষায় থাকে।

৩. উভয় ধরনের অপরাধই বিশ্বব্যাপী ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সংগঠিত হয়ে থাকে। সংগঠিত অপরাধী চক্রের ন্যায় সন্ত্রাসী দলে তাদের অনুসারীদের ভর্তি করে থাকে। অন্য রাষ্ট্রে তাদেরকে প্রশিক্ষণ দেয়, দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে তাদের তহবিল সংগ্রহ করে এবং অন্য রাষ্ট্রে তাদের আক্রমণ পরিচালনা করে থাকে।

সন্ত্রাসী চক্রের অপরাধকে নিম্নবর্ণিতভাবে সংগঠিত অপরাধ (Organised crime) থেকে আলাদা করা যায় ঃ

১. মাঝে মাঝে তহবিল বা বস্তুগত স্বার্থ হাসিল করে থাকলেও সন্ত্রাসী অপরাধীচক্র সব সময় তা করে না। তাদের লক্ষ্য তহবিল সংগ্রহ নয়, তাদের লক্ষ্য তাদের নির্ধারিত বস্তুতে আঘাত হানার কাজকে বিস্তৃত করা। তাদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্র কর্তৃক গৃহীত কোন কার্যক্রমের তারা প্রতিশোধও গ্রহণ করে থাকে। তারা অন্যান্য বিশ্ব, আন্তর্জাতিক সংস্থা এমনকি বিভিন্ন রাষ্ট্রের লক্ষ্যকেও তাদের রাষ্ট্রের উপর চাপিয়ে দিতে চায়।

২. সন্ত্রাসীচক্রের অপরাধীরা তাদের কর্মকান্ডের বৈধতা দেয়ার জন্য তাদের কাজে ধর্মীয়, বুদ্ধিবৃত্তিক বা সাংস্কৃতিক চরিত্র দেয়ার চেষ্টা করে থাকে। তারা ভয়-ভীতি প্রদর্শন বা মানুষ হত্যা করে হলেও তাদের গৃহীত কৌশলের প্রতি মানুষের সহানুভূতি আকর্ষণের চেষ্টা করে থাকে। অপরপক্ষে সংগঠিত অপরাধী চক্র মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক, ধর্মীয় দৃষ্টিকোণের দিকে কোন খেয়াল করে না। তারা কি করল আর কি করল না প্রথমেই তার প্রতি কোন ভ্রুক্ষেপ করে না। সংগঠিত অপরাধী চক্র দক্ষিণ আফ্রিকার ন্যায় স্থানে নেশা জাতীয় দ্রব্য চোরাচালান করে কৃষকদেরকে সাহায্যের নামে তাদের মধ্যে একটি ভিত্তি গড়ে তোলে যাতে এ কৃষকরাই তাদেরকে কাঁচামাল সরবরাহ করতে এগিয়ে আসে।

www.pathagar.com

৩. সন্ত্রাসী চক্র তাদের বার্তা পৌঁছে দেয়ার জন্য, তাদের ধ্যান-ধারণা, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য প্রচারের জন্য এবং তাদের শত্রুদেরকে ভীতি প্রদর্শনের লক্ষ্যে সব ধরনের সংবাদ মাধ্যম ব্যবহার করে। তারা তাদের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে ভীতি সঞ্চার করে এবং মানুষকে এসব ব্যাপারে ভাবিয়ে তোলে। সংগঠিত অপরাধী চক্র অন্ধকারের মধ্যে অত্যন্ত গোপনে সন্ত্রাসী তৎপরতা চালিয়ে থাকে।

তাদের মধ্যকার কর্মতৎপরতার মধ্যে এরূপ ভিন্নতা থাকলেও তারা একে অপরকে এমন কোন ক্ষেত্র নেই যেখানে পরস্পরকে সাহায্য করে না। তারা উভয়েই জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিধি-বিধানের বাইরে কাজ করে থাকে। তারা উভয় চক্রই রাষ্ট্র ও জাতির বিরুদ্ধে কাজ করে। কর্মী বাহিনী ভর্তি করার সময় তাদের প্রশিক্ষণ, সন্ত্রাসী কর্মকান্ড পরিচালনায় ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনায় তাদের পারস্পরিক তহবিল ব্যবহারের সময় সহযোগিতার বিষয়টি পরিস্ফুট হয়।

তিন. অপরাধী কর্মকান্ডের তুলনামূলক বৃদ্ধি ও ন্যায় বিচারের গতি মনিটর করা

বিশ্ব প্রেক্ষাপটে অপরাধ ও ন্যায় বিচারের কার্যকর তুলনামূলক হিসেব বের করা না গেলে এবং এ বিষয়ে তুলনামূলক পরিসংখ্যানগত গবেষণা করা না হলে সন্ত্রাস ও সংগঠিত অপরাধের মোকাবেলায় কোন কার্যকর নীতিমালা বের করা যাবে না। আলবার্ট আইনস্টাইনের বক্তব্য "সবই হিসেব করে বের করতে হবে। যেমন, গুরুত্বপূর্ণ নয় এমন সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ই যে হিসেব করতে হবে বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ নয়," বিষয়টি যদি সঠিকও হয়ে থাকে।

জাতিসংঘ কর্তৃক জারিকৃত বিশ্বব্যাপী কৃত অপরাধের পরিমাণ, অপরাধীর প্রতি কৃত ন্যায় বিচারের সংখ্যাগত দুষ্প্রাপ্য উপাত্তকে আমাদের মেনে নিয়েই কাজ করতে হবে। এ ধরনের জরিপ ১৯৭০ থেকে ২০০১ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে সাতবার পরিচালিত হয়। কি পরিমাণ অপরাধ সংগঠিত হলো তার বৃদ্ধির তুলনামূলক হিসাব, অনেক সময় গবেষণায় অনুসৃত পদ্ধতি উন্নততর গবেষণার আসল সমস্যার সৃষ্টি করে থাকে। সেজন্য গবেষণার সময় বিভিন্ন ধরনের পদ্ধতি ব্যবহারে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। যেসব বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে সেগুলো হলো, অপরাধ সংগঠনের বিষয়ে এক দেশ থেকে আরেক দেশে অপরাধের আইনগত সংজ্ঞা, সংগঠিত অপরাধের কম আর বেশি হারের নিবন্ধিকরণ, প্রয়োজনীয় সংখ্যক পুলিশ ফাঁড়ির অবস্থান, জনসংখ্যা ও পুলিশ ফাঁড়ির আনুপাতিক হার, অপরাধ সংগঠনের জন্য বীমা ব্যবস্থা, সামাজিক পরিবেশ যা কোন কোন সমাজকে ধর্ষণ ও যৌন হয়রানির ন্যায় অপরাধ প্রতিরোধে প্রভাবিত করতে পারে।

জাতিসংঘের পরিচালিত অপরাধ সম্পর্কিত গবেষণায় ১৯৮০ থেকে ২০০০ সালের রেকর্ডকৃত সংগঠিত অপরাধের তালিকা থেকে দেখা যায় ১৯৮০ সালে ১০,০০০ জনের মধ্যে অপরাধের সংখ্যা ছিল ২৩০০, ২০০০ সালে তা বেড়ে ৩০০০ তে উপনীত হয়। এর থেকে দেখা যায় বিশ্বব্যাপী গত দু'দশকে অপরাধের সংখ্যা মারাত্মকভাবে বেড়ে গিয়েছে। এ চিত্র একেক দেশে এবং একেক মহাদেশে একেক রকম।

www.pathagar.com

অপরাধ সংগঠনের হিসেব বের করার জন্য জাতিসংঘের গবেষণায় যেসব ব্যবস্থা বিবেচনায় আনা হয়েছে তার মধ্যে বিভিন্ন বিচার ব্যবস্থায় অপরাধকারীদের বন্দী করা, তাদের বিরুদ্ধে বৈধ পন্থায় মামলা রুজু করা এবং বিভিন্ন দন্ড আরোপ করা; পুলিশ বাহিনী, বিচারক, বিচার বিভাগের কর্মচারী, বিচার ব্যবস্থার জন্য বাজেট বরাদ্ধ বৃদ্ধি, বিচার ব্যবস্থার বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা বন্টনের ব্যবস্থা গ্রহণ উল্লেখযোগ্য। প্রয়োজনীয় বিষয়টি হলো অপরাধ মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মচারী ও সম্পদ। যেমন, বিশ্বের বিভিন্ন অংশে জনসংখ্যা আর পুলিশের জনবলের আনুপাতিক হার। পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে এ হার প্রতি ৪০০ জনে ১ জন পুলিশ (আফ্রিকায় প্রতি ১০০০ জনে ১জন)। বিচারকের হার প্রতি ১৫০০০ জনে ১ জন বা কর্মচারীর হারও একই রকম (আফ্রিকায় এ হার আরও কম)। এর দ্বারা এটি বুঝায় না যে, এসব দেশে অপরাধ সংগঠনের হার কম তবে এখানে অপরাধের চেয়ে ন্যায় বিচার করার হার অধিক।

সম্পদের কথা বলতে গেলে দেখা যায়, বিশ্বের দেশগুলো তাদের মোট জাতীয় উৎপাদনের (GDP) একাংশের চেয়েও কম পুলিশ বাহিনীর জন্য খরচ করে। যে দেশে অপরাধ সংগঠনের হার বেশি সে দেশে অপরাধের বিচারের জন্য ব্যয়ও বেশি হয়। বলতে গেলে প্রতিরোধের চেয়ে এসব ক্ষেত্রে অপরাধের প্রতিকারই বেশি করা হয়।

আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সংগঠিত অপরাধ (Organised crime) এবং সন্ত্রাসবাদ নিয়ন্ত্রণের মডেল

সংগঠিত অপরাধ (Organised crime) ও সন্ত্রাসবাদকে বৈশ্বিকভাবে মোকাবেলার জন্য প্রথমে প্রত্যেক রাষ্ট্রে জাতীয় পর্যায়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বিচার বিভাগের অধীনে বিভিন্ন কোর্ট, সাধারণ প্রসিকিউশন সেন্টার যথেষ্ট সংখ্যায় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এটি করা যেতে পারে।

সংগঠিত অপরাধ (Organised crime) ও সন্ত্রাসী অপরাধের (Terrorist crime) প্রকৃতি আর তাদের উঠানামা ও তাদের আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় রেখে অপরাধীর মোকাবেলায় আন্তর্জাতিক সহযোগিতা আবশ্যকীয় হয়ে পড়েছে। এরূপ সহযোগিতার জন্য প্রয়োজন সমন্বিত অভ্যন্তরীণ বিধি-বিধান, কার্যকর জাতীয় বিচার ব্যবস্থা, সন্ত্রাসী ও সন্ত্রাসী চক্রের মোকাবেলায় সহায়ক আন্তর্জাতিক চুক্তি, সন্ত্রাসীচক্রে নিয়োজিতদেরকে শাস্তি দেয়া ও তাদেরকে মামলার মুখোমুখি করা, আর্থ-সামাজিক ঐসব কাঠামো ধ্বংস করে দেয়া যেখানে এসব সন্ত্রাসবাদ আর অপরাধ সংগঠিত হয়।

প্রকৃতপক্ষে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অপরাধী চক্রের মোকাবেলার কনভেনশন রয়েছে। তবে বিভিন্ন রাষ্ট্রের বিচারিক কর্তৃপক্ষের মধ্যে প্রয়োজনীয় যোগাযোগের অভাবের কারণে, বিভিন্ন রাষ্ট্র কর্তৃক এসব কনভেনশন অনুমোদনের পর এগুলোর মর্যাদা সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব, এগুলোর প্রয়োগ ও অপ্রয়োগের মাত্রা, রাষ্ট্রের অনিচ্ছার কারণে বিভিন্ন কৌশল বাস্তবায়নে বিভিন্ন প্রটোকল অনুমোদন না করা, অনুন্নয়ন, দারিদ্র, বেকারত্ব ও বঞ্চনার কারণে আন্তর্জাতিক কনভেনশনগুলো কাজ করছে না।

www.pathagar.com

সংগঠিত অপরাধ দমনের জন্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতার কথা বলতে গেলে বিশেষভাবে ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ই ইউ) অভিজ্ঞতার উল্লেখ করতে হয়। এ ব্যাপারে এটিকে মডেল হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে। ই ইউ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে উন্নয়নের পর এবার একীভূত ইউরোপীয় বিচার ব্যবস্থার দিকে নজর দিয়েছে। এ পর্যায়ে দু'টো গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের কথা উল্লেখ করা যায়। এগুলো হলো ইউরোপীয়ান জুডিসিয়ারী নেটওয়ার্ক ও ইউরোযাস্ট (Eurojust)। এগুলো ছাড়াও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে রয়েছে ইন্টারপোল।

১. ইউরোপীয়ান জুডিসিয়ারী নেটওয়ার্ক : এটি ই ইউ'র অন্তর্ভুক্ত সদস্য রাষ্ট্রসমূহের জজদের (Judge) একটি নেটওয়ার্ক। জজগণ এ নেটওয়ার্কের লিয়াঁজো রক্ষা করে থাকে। তাদের কাজ সদস্য দেশকে সাধারণ তথ্য (প্রয়োগযোগ্য আইন ও বিচারিক সংগঠন) এবং বিশেষ তথ্য (নিজ নিজ দেশের জজদেরকে বিশেষ দায়িত্বের সাথে পরিচিত করে তোলা) বা সঠিক কারিগরী সমর্থন দেয়া (প্রয়োগযোগ্য পদ্ধতি)

২. ইউরোযাস্ট (Eurojust) : এটি ২৫ জন জজ সমন্বয়ে গঠিত (ই ইউ রাষ্ট্রের প্রত্যেক রাষ্ট্র থেকে একজন করে)। তাদের মূল দায়িত্ব ব্যবহারযোগ্য বিচার বিভাগীয় উপাত্ত বিনিময়ের নিশ্চয়তা বিধান, সংশ্লিষ্ট দেশসমূহের মধ্যে সাধারণ কার্যাবলীর সমন্বয় সাধন, বিশেষ করে অনেকগুলো সদস্য রাষ্ট্রের মধ্যে বিচার বিভাগীয় সহযোগিতার জন্য অনুরোধে সাড়া দেয়া। জাতীয় সংবিধানের আওতায় হলে জজদের কেউ কেউ তাদের নিজস্ব রাষ্ট্রের বেলায় হস্তক্ষেপ করার ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে, অন্যদের বেলায় এ ক্ষমতা নেই। উদাহরণস্বরূপ দেখা যায়, ইউরোযাস্টের (Eurojust) বেলজিয় সদস্য সরাসরি বেলজিয় বিচারিক ক্ষমতার উপর অন্তত প্রথম দিকে হস্তক্ষেপ করতে পারে না। এর পরিবর্তে বেলজিয় প্রতিনিধি ফেডারেল বেলজিয় প্রসিকিউশনকে তার অনুরোধ করে পাঠাতে পারে।

ইউরোপীয় বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠায় ইউরোযাস্ট একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে কাজ করে। সুইজারল্যান্ড ও রোমানিয়া যারা এখানো ই ইউ'র সদস্য নয় তাদের জন্য এ ব্যবস্থা একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

৩. ইন্টারপোল (ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিনাল পুলিশ অর্গানাইজেশন, INTERPOL) : এ সংস্থা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সংগঠিত অপরাধ মোকাবেলায় প্রধান আন্তর্জাতিক হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে। বিশ্বের সব রাষ্ট্র এর সদস্য। সন্ত্রাসী অপরাধ, সংগঠিত অপরাধ এবং বিশ্বব্যাপী ওয়ান্টেড ব্যক্তিদের খুঁজে বের করার দায়িত্ব অর্পণের সাথে সাথে তাদের উপর অর্পিত দায়িত্বের বোঝা বেড়ে গিয়েছে। ড্রাগ চালান, নারী ও শিশু পাচার, নরহত্যা, যুদ্ধাপরাধ, মেধাস্বত্ব পাচার, অর্থনৈতিক অপরাধ, দুর্নীতি - এর ন্যায় অপরাধ ছাড়াও তাদের অপরাধের তালিকায় পরিবেশ, প্রযুক্তিগত এবং অন্যবিধ অপরাধও যুক্ত হয়েছে। এর ফলে ই ইউ প্রতিষ্ঠিত আঞ্চলিক সংস্থাগুলোর সাথে ইন্টারপোলের কর্মকান্ড বেড়ে গিয়েছে।

www.pathagar.com

আফ্রিকা ও ইসলামী বিশ্বেও সংগঠিত অপরাধ ও সন্ত্রাসবাদ মোকাবেলায় এজাতীয় সংগঠন প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। বহুবিধ আন্তর্জাতিক চুক্তির জন্য ব্যবহারিক, নির্বাহী ও কৌশলগত ক্ষমতার উন্নয়ন ঘটাতে হবে। ও আই সি'র কনভেনশনসহ আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ দমনে নির্বাহী ক্ষমতার উন্নয়ন ঘটাতে হবে।

সন্ত্রাসবাদ ও সংগঠিত অপরাধ মোকাবেলায় অগ্রগতি

সন্ত্রাসবাদ ও সংগঠিত অপরাধের বেশিরভাগই বিশ্ব প্রেক্ষাপটে ঘটছে। বিশ্বায়নের যুগে তথ্য প্রযুক্তির বিরাট উন্নয়নের ফলে ধ্যান-ধারণা, দ্রব্য ও সেবার প্রবাহ বেড়ে যাওয়ার কারণে এ উন্নয়নগুলো সন্ত্রাসী ও সংগঠিত চক্রের অস্ত্রে পরিণত হয়েছে। তথ্য ও কম্পিউটার জগত বিবিধ অপরাধের সাথে ব্যাপকভাবে জড়িয়ে পড়েছে। ফলে অপরাধ পৃথিবীর যে কোন প্রান্তে ঘটতে পারে। আর কম্পিউটার ব্যবহারকারী যে কারো বিরুদ্ধে ঘটাতে পারে। তথ্য প্রযুক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট অপরাধ সংগঠনকারী নির্ধারণ ও আইন বাস্তবায়নের অসুবিধার কারণে অপরাধী মোকাবেলা করা কঠিন হয়ে পড়েছে।

এসব কঠিন অপরাধের কারণে সকল রাষ্ট্রকে এগুলোর মোকাবেলায় আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বাড়াতে হবে। সন্ত্রাস ও সংগঠিত অপরাধ দমনের জন্য এবং এসব চক্রকে ধ্বংস করে দেয়ার জন্য নির্বাহী কৌশল উদ্ভাবন করতে হবে। সন্ত্রাসবাদ ও সংগঠিত অপরাধ দমনে নিরাপত্তাভিত্তিক পদ্ধতি গ্রহণ আবশ্যক হয়ে পড়েছে। এরপরও বলতে হবে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থার চেয়ে প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা যথেষ্ট নয়। সন্ত্রাসবাদ মোকাবেলায় নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিগুলোও ব্যাপকভাবে গ্রহণ করতে হবে ঃ

১. সন্ত্রাসবাদ ও সংগঠিত অপরাধ মোকাবেলায় এবং সন্ত্রাসবাদ প্রতিরোধে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য সকল রাষ্ট্রকে এগিয়ে আসতে হবে।

২. সকল রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক সংস্থা এক যোগে অনুন্নয়ন, দারিদ্র ও বঞ্চনাকে মোকাবেলা করতে হবে। এ কারণগুলো সন্ত্রাসবাদী ধ্যান-ধারণা ও বিভিন্ন ধরনের অপরাধ বৃদ্ধির জন্য সহায়ক।

৩. আন্তর্জাতিক বিবাদ ও উদ্বেগ (Tension) ন্যায়ভিত্তিক ও সঠিকভাবে নিষ্পত্তি করতে হবে এবং সকল ধরনের উপনিবেশিক দখলদারিত্ব ও জাতিগত বিভেদ দূর করতে হবে।

৪. মানবাধিকার ও মানব মর্যাদা রক্ষা করতে হবে। এ অধিকারগুলো ক্ষুন্ন হয় এ অজুহাতে ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনার ন্যায় সন্ত্রাসবাদ ও সংগঠিত অপরাধ মোকাবেলায় চুপচাপ বসে থাকা যাবে না।

সংস্কৃতি ও সন্ত্রাসী চিন্তা

সন্ত্রাসবাদ বর্তমানে একটি আন্তর্জাতিক বিষয়। এর কারণে মানব সমাজ আজ অস্থিরতার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। মানুষের মধ্যে সহাবস্থানের ধারণাকে নষ্ট করে দিচ্ছে। সন্ত্রাসবাদকে সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামো থেকে পৃথক করে দেখার কোন উপায়

www.pathagar.com

নেই। এর রয়েছে একটি প্রেক্ষাপট। এটিকে শুধুমাত্র রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট থেকেই চিন্তা করলে চলবে না। অন্য প্রেক্ষাপট থেকেও এটিকে দেখতে হবে।

এখানে সন্ত্রাসবাদের সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটটিকেই আলোচনা করা হবে। মানুষের অধিকার আর সহিষ্ণুতাবোধের বিবেচনায় এখানে মূল্যবোধ ও নিয়ম কানুনের কোন মূল্যায়ন করা হয় না। সন্ত্রাসবাদ কোন নির্দিষ্ট সমাজ বা সংস্কৃতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। এর কোন নির্দিষ্ট ধর্ম বা ভৌগলিক সীমারেখা নেই। সে জন্য এটিকে নির্দিষ্ট কোন ধর্ম, সংস্কৃতি বা আঞ্চলিকতার ভিত্তিতে মূল্যায়ন করা যাবে না। এটিকে কোন একটি মাত্র শর্তের আওতায় চিন্তা করা যাবে না।

মানবেতিহাসের গবেষণায় দেখা যায় পারস্পরিক জ্ঞানের আদান-প্রদান, সহিষ্ণুতা ও পরস্পরের সংস্কৃতি ও সভ্যতার প্রতি শ্রদ্ধাবোধের অভাব আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতাকে প্রভাবিত করছে। আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের সাম্প্রতিক বৃদ্ধি বিশ্ব মতের পার্থক্য কমিয়ে আনা, বিভিন্ন রাষ্ট্রের সংস্কৃতি, স্বার্থ আর মূল্যবোধের উপর আলাপ-আলোচনার গুরুত্ব আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। এছাড়াও সহিষ্ণুতা, পরস্পরের সংস্কৃতির পার্থক্য কমিয়ে আনা আজ জরুরী হয়ে পড়েছে। এর অনুপস্থিতিতে সভ্যতা, ধর্ম ও সংস্কৃতির বিভিন্নতার কারণে মানবজাতির বিভিন্ন বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্যের বন্ধন সূচীত হয়েছে। পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার জন্য সভ্যতা ও সংস্কৃতি সমৃদ্ধশালী হয়েছে। বিভিন্ন বাধা বিপত্তির কারণে গোঁড়ামি ও শত্রুতার সৃষ্টি করলেও সমগ্র মানবেতিহাসে সভ্যতার মধ্যে ইতিবাচক ভাব বিনিময়ের মাধ্যমে দেখা যায় একেশ্বরবাদী তিনটি ধর্মের মধ্যে অনেকগুলো জিনিসই এক। ইসলাম, খ্রিস্টবাদ ও ইহুদীবাদের বিশ্বাস, বিধি-বিধান, আচার-অনুষ্ঠান ও মূল্যবোধের মধ্যে পার্থক্য থাকলেও এক আল্লাহ ও নীতিগত দিক দিয়ে তাদের মধ্যে মিল রয়েছে। ইতিহাস পরম্পরায় তাদের মধ্যে বাদ-বিসম্বাদ চলে থাকলেও বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে বোঝাপড়া রয়েছে। তারা যেন বিভিন্ন পথে একে অপরকে প্রভাবিত করছে।

অনেকগুলো ভুল বুঝাবুঝির কারণে ও ভুল ধারণার কারণে কোন কোন সংস্কৃতির ব্যাপারে অন্য সংস্কৃতির ভুল ধারণার ভিত্তি রচিত হয়েছে। এসব ভুল বুঝাবুঝির কারণেই মানুষের মধ্যে চরমপন্থি ও ঘৃণার সৃষ্টি হয়েছে। প্রতিদিনের ভুল বুঝাবুঝি ও অন্য ধর্মের ব্যাপারে ভুল ধারণা এবং সাংস্কৃতিক নির্ভরশীলতা ভুল ব্যাখ্যার কারণেই সৃষ্টি হয়েছে। এসব কারণেই সন্ত্রাসবাদের উৎপত্তি হয়েছে। কোন ধর্মই মতামতের ভিন্নতার কারণে রক্তপাতের অনুমতি দেয় না বরং আলাপ-আলোচনা ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের কথাই সকল ধর্মের আদর্শে বলা হয়েছে।

পশ্চিমা দেশ ও মুসলিম বিশ্বের মধ্যে অতীতে শত বৎসর ধরে দ্বন্ধ-সংঘাত চলেছে। যার কারণে ক্রুসেড হয়েছে, আন্দালুসের পতন হয়েছে, আরব ও ইসলামী দেশগুলো পশ্চিমা বিশ্বের উপনিবেশে পরিণত হয়েছে, মধ্যপ্রাচ্যে বিরোধের সৃষ্টি করেছে। এ ঘটনাগুলো প্রত্যেক মুসলিম ও পশ্চিমার মধ্যে ক্ষত সৃষ্টি করেছে, উভয় পক্ষের সংস্কৃতির মধ্যে

www.pathagar.com

শত্রুতার সৃষ্টি করেছে। এ কারণে একটি মনস্তাত্ত্বিক বিরোধের সৃষ্টি হয়েছে। বিশেষ করে অনেক পশ্চিমা লেখক এ ব্যাপারে বিরূপ ভূমিকা পালন করেছে। পশ্চিমা ধারণার আবির্ভাবের ফলে মানব সমাজের অস্থিরতা বেড়ে গেছে। পশ্চিমাদের ধারণা হলো ইসলাম ও পশ্চিমা সভ্যতার মধ্যে সংঘাত অনিবার্য। ইসলামী সংস্কৃতির বিরুদ্ধে বিভিন্ন অপবাদ দেয়া হয়। ইসলামকে সন্ত্রাসী সংস্কৃতি বলতেও তারা কুণ্ঠা করে না।

সন্ত্রাসবাদের সৃষ্টি এবং পশ্চিমা চিন্তাবিদদের দ্বারা বিভিন্ন সভ্যতার সংঘাতের ব্যাপারে সতর্কীকরণের মধ্যে এটিই পরিস্ফুট হয়ে উঠে যে, সভ্যতার মধ্যে সংঘাত অনিবার্য। আজ যা দেখা যাচ্ছে তা শতাব্দীর পর শতাব্দী থেকে চলে আসা ইসলাম ও খ্রিস্টান সংস্কৃতির মধ্যকার সংঘাত। আজ আমাদের প্রত্যেকেরই দায়িত্ব হয়ে দাঁড়িয়েছে শান্তির সংস্কৃতি ও বিভিন্ন সংস্কৃতির মধ্যে সহিষ্ণুতা বৃদ্ধি করা। আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ সবারই শত্রু - এ বিষয়ে আমাদেরকে জোর দিতে হবে। এটি কোন বিশেষ সংস্কৃতি বা সভ্যতা থেকে আসেনি। সবার সাধারণ স্বার্থ, সহযোগিতা, বোঝাপড়া ও জাতিতে জাতিতে আলাপ-আলোচনা ছাড়া কারোরই টিকে থাকা সম্ভব নয়।

সন্ত্রাসবাদের কথা আলোচনা করতে গিয়ে বিভিন্ন দেশের সংখ্যা গুরুর মধ্যে সংখ্যালঘুর সংস্কৃতি ও তাদের ধর্ম সম্পর্কেও আমাদেরকে ভাবতে হবে। এসব সংখ্যালঘুরা মৌলিক অধিকার বঞ্চিত হয়ে, বিশেষ করে তাদের বিশ্বাসের অধিকার, তাদের মানবাধিকার, সাংস্কৃতিক স্বাধীনতার অভাবে তারা তাদের অধিকার কায়েমে সন্ত্রাসের পথ বেছে নেয়। সেজন্য তাদের যে দেশে বাস সে দেশে অন্যদের ন্যায় সমান অধিকারের ভিত্তিতে তাদের সাংস্কৃতিক সত্ত্বা রক্ষার অধিকার তাদেরকে দিতে হবে।

সন্ত্রাসবাদের সংস্কৃতি ও মিডিয়া শিক্ষা

মিডিয়া ও শিক্ষা একটি অপরটির পরিপূরক। তারা সমাজের নাড়ি হিসেবে কাজ করে। ভুল শিক্ষা ও মিডিয়া আদর্শগত বিচ্যুতি ঘটিয়ে থাকে। এগুলোর জন্য মানবজাতির স্বার্থের হানি হয়। সেজন্য সন্ত্রাসবাদ মোকাবেলায় সকল দেশেরই উচিত ভুল চিন্তা দর্শন থেকে মিডিয়া ও শিক্ষা কৌশলকে ঠিক পথে পরিচালনার জন্য প্রচেষ্টা চালানো।

এ লক্ষ্যে আলাপ-আলোচনার সংস্কৃতি ও পারস্পরিক বোঝাপড়ার সংস্কৃতির বিষয়টি স্কুলের কারিকুলাম ও পাঠ্য বইয়ে সংযুক্ত করতে হবে। টেক্সট বই ও কারিকুলামে যাতে অন্যের সংস্কৃতি সম্বন্ধে বিরূপ কিছু সংযোজিত করা না হয়, যে বিষয়গুলো তাদের মধ্যে ঘৃণা ছড়াতে পারে ও তাদের ভাবমূর্তি নষ্ট করতে পারে এমন কিছু পাঠ্যপুস্তকে থাকবে না। সাংস্কৃতিক সহিষ্ণুতা ও সাংস্কৃতিক আলাপ-আলোচনা বিস্তারের কাজে মিডিয়া প্রতিষ্ঠানগুলোকে উৎসাহিত করতে হবে। অন্যের সংস্কৃতির প্রতি স্বীকৃতি, সংস্কৃতির বহুমুখীতার প্রতি মিডিয়াকে প্রচার প্রপাগান্ডায় উৎসাহ যোগাতে হবে। সাংস্কৃতিক আলাপ-আলোচনা এবং এসব বিষয়ে মিডিয়াকে অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে। মিডিয়ায় কাজের সময় নিরপেক্ষ হতে হবে। কোন তথ্যকে এমনভাবে পরিবর্তন করা যাবে না

www.pathagar.com

যাতে অন্যের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হতে পারে। মিডিয়ার বিভিন্ন বিষয়কে পরস্পরের মধ্যে বিনিময়ের ব্যবস্থা করতে হবে যাতে অন্য সংস্কৃতির জনগণের সাথে পরিচিত হওয়া যায় এবং অন্যের ভাষা সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়। অনুবাদের কাজকে উৎসাহিত করতে হবে যাতে সাংস্কৃতি প্রতিবন্ধকতাটি ভেঙ্গে ফেলা যায়।

পশ্চিমা মাধ্যম পক্ষপাতমূলক প্রচারে নেতিবাচক ভূমিকা পালন করছে। তাদের প্রচারণায় ইসলামী সংস্কৃতিকে সংঘাতের সংস্কৃতি বলে চিহ্নিত করা হচ্ছে। আরও প্রচার করা হচ্ছে ইসলামে গণতন্ত্র নেই এবং এখানে মানুষের মৌলিক স্বাধীনতা নেই। এরূপ প্রচারণার ফলে বিভিন্ন গ্রুপের মধ্যে বুঝাবুঝির বিরাট পার্থক্য সৃষ্টি হচ্ছে। এর ফলে ইসলামী ও পশ্চিমা বিশ্বে চরমপন্থী দলের সৃষ্টি হচ্ছে। তারা পরস্পরকে মোকাবেলা করার নীতি গ্রহণ করছে। এর ফলে সন্ত্রাসের পরিধি সম্প্রসারিত হচ্ছে, সমাজকে বিপদের দিনে ঠেলে দিচ্ছে, সন্ত্রাস ও প্রতিসন্ত্রাসের (Anti terrorism) জন্ম দিচ্ছে।

আমরা যেমন পূর্বে বলেছি, সন্ত্রাসবাদের বিষয়টি মোকাবেলা করার জন্য আমাদের অনেকগুলো বিষয়ের মোকাবেলা করতে হবে। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো পরিবারের প্রতি রাষ্ট্রের সমর্থন বাড়িয়ে দেয়া। যুবক সম্প্রদায়ের জন্য উন্নত ধরনের শিক্ষার ব্যবস্থা করা, আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও যথাযথ শিক্ষামূলক মূল্যবোধ শিক্ষার কারিকুলামে অন্তর্ভুক্ত করা। এছাড়া ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোরও সন্ত্রাসবাদের কারণ সম্পর্কে গবেষণা করা উচিত এবং সন্ত্রাসবাদ যাতে বেড়ে না যায় সেজন্য চেষ্টা করা উচিত। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর এ ব্যাপারে জোর দেয়া উচিত যে, আল্লাহ্ প্রদত্ত বিধি-বিধান মেনে না চললে এবং দেশের আইন-কানুন পালন না করলে মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা রক্ষিত হবে না। স্বাধীনতার বিষয়টি এমন হবে না যা জাতিগত সংঘাত সৃষ্টি করে, ধর্মীয় ঘৃণা সৃষ্টি করে এবং চরমপন্থার সৃষ্টি করে যার পরিনাম সন্ত্রাসবাদের সৃষ্টি করতে পারে।

সন্ত্রাসবাদ মোকাবেলায় সাংস্কৃতিক আলাপ-আলোচনা বৃদ্ধিতে ও আই সি'র ভূমিকা

প্রতিষ্ঠার পর থেকেই ও আই সি মুসলিম দেশ ও অন্যান্য বিশ্বের সাথে সম্পর্ক শক্তিশালী করার কাজ করে আসছে। সংস্থাটি ইসলামী সভ্যতার মূলনীতির সাথে অসংগতিপূর্ণ এরূপ ধর্মীয় গোঁড়ামি, চরমপন্থা ও সন্ত্রাসবাদের বিরোধিতা করেছে। ইসলাম সব মানুষের ভিত্তিকে একইরূপ বিশ্বাস করে। মানুষের মর্যাদায় বিশ্বাস করে এবং দুনিয়াতে মানুষকে ইসলাম আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে মনে করে। এ প্রসঙ্গে ও আই সি গঠনমূলক সহযোগিতার লক্ষ্যে সাধারণ ক্ষেত্র বের করার জন্য বিভিন্ন সভ্যতার মধ্যে একটি চিরন্তন আলাপ-আলোচনা শুরুর জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ উদ্যোগের অংশ হিসেবে নৈতিক, আচরণমূলক ও সভ্যতার মূল্যবোধকে একবিংশ শতাব্দীর বিশ্বব্যবস্থার জন্য একটি মৌলিক বিষয় হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।

ওআইসি বিভিন্ন সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ধর্মের মধ্যে আলাপ-আলোচনা চালানোর বিষয়টিকে সর্বাধিক গুরুত্ব গিয়েছে। অনেকগুলো মহাসম্মেলন, মন্ত্রী পর্যায়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে এ আলাপ-আলোচনাকে জোরালো করা হয়েছে। ও আই সি এ ধরনের

www.pathagar.com

আলোচনাকে এগিয়ে নেয়ার জন্য কতগুলো পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এর ফলে OIC-EU জয়েন্ট ফোরামের অভ্যুদয় ঘটেছে। এছাড়াও প্রাসঙ্গিক সংস্থাগুলোর সাথে সার্বক্ষণিক সমন্বয় সাধনের ফলে সংস্কৃতির সাধারণ ঐতিহ্য, সহিষ্ণুতা, আলোচনা ও জাতিতে জাতিতে এবং মানুষে মানুষে সহযোগিতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এ লক্ষ্যে ও আই সি UNESCO, ISESCO, ইউরোপীয় কাউন্সিল, OSCE, আরব লীগ, আফ্রিকান ইউনিয়ন ছাড়াও বার্সিলোনা ফোরাম এবং ইন্টারন্যাশনাল এজেন্ডা'র ন্যায় সংস্থার সাথেও সম্পর্ক স্থাপন করেছে। এ লক্ষ্যে মানুষের মধ্যে সহিষ্ণুতা বৃদ্ধি ও আপোষের ভাব বৃদ্ধির লক্ষ্যে অনেকগুলো সিম্পোজিয়ামের আয়োজন করা হয়েছে।

ও আই সি নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলোর উপর গুরুত্বারোপ করেছে :

- সমগ্র মানবেতিহাসে দেখা যায় ইসলামী সভ্যতা সহাবস্থান, সহযোগিতা ও বোঝাপড়ার জন্য অন্য সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ধর্মের সাথে অবিরাম কাজ করে আসছে।
- বিভিন্ন সংস্কৃতিকে সাহায্য করে আসছে এবং একে অপরকে পরিপূরক হিসেবে সাহায্য করছে।
- অন্য সংস্থা ও কর্তৃপক্ষের সাথে সেমিনার ও সিম্পোজিয়ামের আয়োজন করতে হবে। এসব সেমিনারে সংস্কৃতি উন্নয়ন ও সভ্যতার ব্যাপারে আলাপ-আলোচনাকে গুরুত্ব দিতে হবে। এসব আলাপ-আলোচনায় ইসলামের বৈশিষ্ট্যকে গুরুত্ব দিতে হবে। আর এটিও নিশ্চিত করতে হবে যে, বিভিন্ন সংস্কৃতি ও সভ্যতার মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের মাধ্যমেই সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিকশিত হতে পারে।
- মানুষের আত্মরক্ষার অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শনই হলো বিশ্বে নিরাপত্তা ও শান্তির আসল উপায়।
- ধর্মের প্রতি এবং সংখ্যালঘুদের সমস্যা ও যুদ্ধ বিগ্রহ হ্রাসের দিকে নজর দিতে হবে।
- শিক্ষা ও আলাপ-আলোচনার সংস্কৃতিকে ছড়িয়ে দিতে হবে। এর ফলে বিভিন্ন সংস্কৃতির মধ্যে যোগাযোগ বাড়বে।
- ইসলামী বিশ্বের সাংস্কৃতিক কৌশলকে বাস্তবায়নের জন্য এবং উদ্দীপনা সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন কৌশলকে সক্রিয় করতে হবে, দ্বিগুণ উদ্যমে প্রচেষ্টা চালাতে হবে, দক্ষতা ও সম্পর্ককে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে হবে।
- পারস্পরিক বোঝাপড়ার ভিত্তি স্থাপনের লক্ষ্যে বিভিন্ন জাতি ও মানব সভ্যতার বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সাংস্কৃতিক সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটাতে হবে। বিভিন্ন দেশের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক পদ্ধতির বৈচিত্রের মধ্যে এবং তাদের সাংস্কৃতিক বিশেষত্বের মধ্য থেকেই এ সম্পর্ক উন্নয়নের চেষ্টা করতে হবে।

** ২০০৫ সালের ৫-৮ ফেব্রুয়ারী রিয়াদে অনুষ্ঠিত ও আই সি'র আন্তর্জাতিক সম্মেলনে সন্ত্রাসবাদ মোকাবেলার উপর প্রণীত সুপারিশমালা*

www.pathagar.com

www.pathagar.com